স্বস্তিকা

দীপাবলী সংখ্যা (বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা বিশেষ সংখ্যা)।। ১৯ অক্টোবর - ২০০৯।। দাম ঃ ৬.০০ টাকা

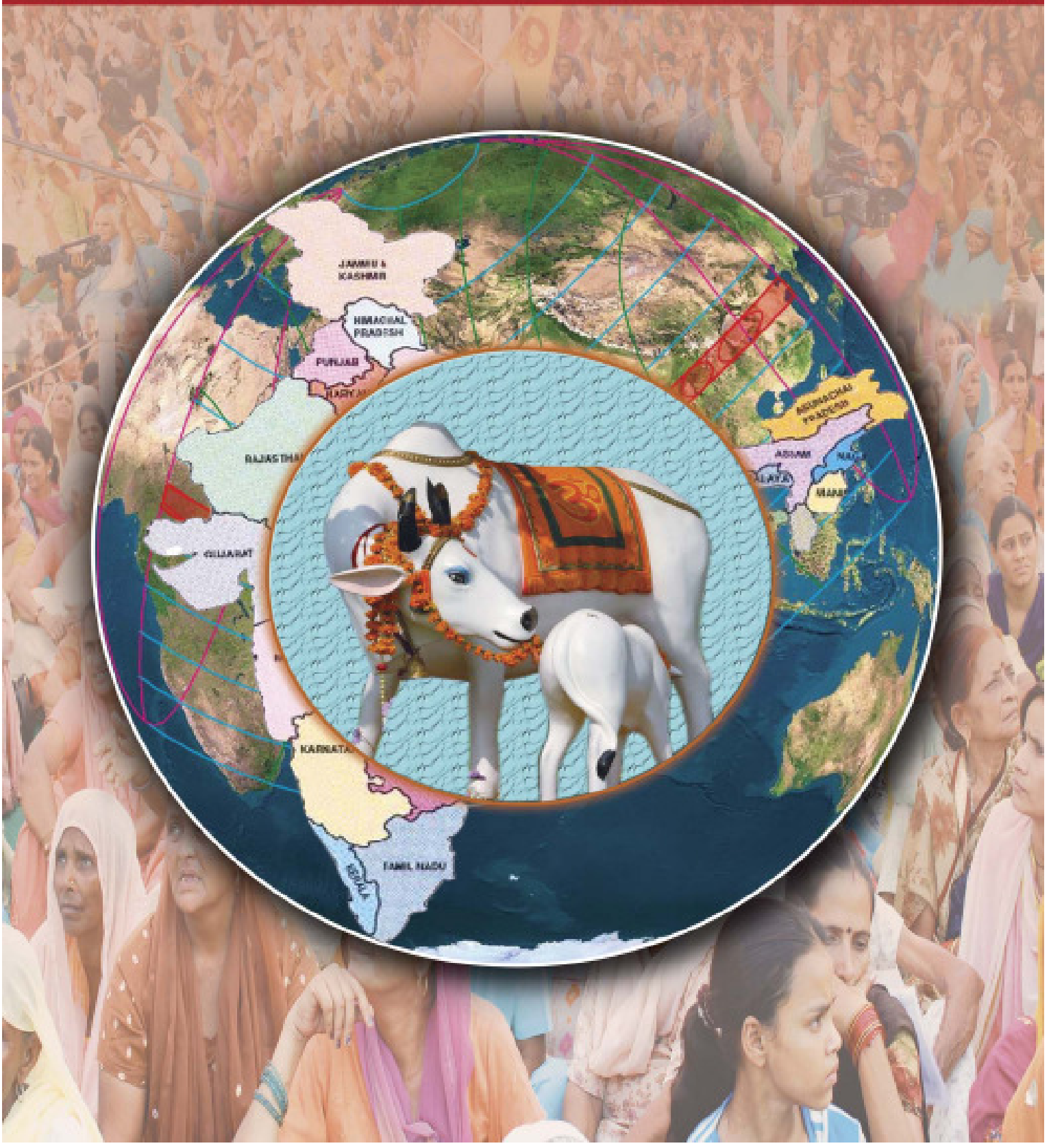

সূচীপত্র

■ **সম্পাদকীয়** ● ৩

■ **মা শক্তিরূপিণী মহাকালী ❖**

গোপাল চক্রবর্তী ● ৪

■ **দীপান্বিতা শ্যামাপূজার কাল ❖**

স্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী ● ৬

■ **পাশ্চাত্যের বিকাশের ভ্রান্ত ধারণা থেকে আমাদের বাঁচতে হবে ❖**

মোহনরাও ভাগবত ● ৭

■ **গো-মাতা বন্দনা ❖**

শিবাশিস্ দণ্ড ● ১০

■ **গোরু নিয়ে দলাদলি ❖**

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ● ১১

■ **গাধার জন্য গোরু বাড়ছে না ❖**

অসিতবরণ আইচ ● ১৪

■ **সীমান্তে বাড়ছে জনসংখ্যা, কমছে গবাদি পশু ❖**

নবকুমার ভট্টাচার্য ● ১৫

■ **অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলায় গো-অর্থনীতি ❖**

অর্ণব নাগ ● ১৭

■ **সাক্ষাৎকার ঃ রাঘবেশ্বর ভারতী স্বামীজী ❖**

● ২০

■ **পশ্চিমবঙ্গের গো-শালা ❖**

সতীনাথ রায় ● ২৪

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ ঃ **অজিত ভকত**

।। দাম ৬ টাকা।।

Registered No.-SSRM/Kol.RMS/W.B/RNP-048/2007-09

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. - SSRM-KOL.RMS/RNP-048/LPWP-021/2007-09 ● R N I No. 5257/57

দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫,

টেলিফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা - ৬ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদক।। **বিজয় আঢ্য**

সহযোগী ।। বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

শুভ দীপাবলীর
প্রীতি ও শুভেচ্ছা....

— জনৈক শুভানুধ্যায়ী

স্বস্তিকা

দীপাবলী সংখ্যা

৬২ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১১

১৯ অক্টোবর, ২০০৯

সম্পাদকীয়

ভারতকে জিতাইতে হইবে

স্বাধীনোত্তর ভারতে গত বাষট্টি বছরে গ্রামের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে যেন গ্রহণ লাগিয়াছে। গ্রামকে শহরে পরিবর্তনের চাপে গ্রাম আজ বিধবস্ত। গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার ভিত্তি কৃষি ও প্রাণী সম্পদ উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দু হইয়া উঠিয়াছে। পরিকাঠামোর অভাব ও সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে কৃষি আজ ধবংসোন্মুখ, বিপন্ন প্রাণী সম্পদ।

পাশ্চাত্যের তথাকথিত বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন এবং জীবনযাত্রার প্রভাবে আক্রান্ত আজ আমাদের সামাজিক ভিত্তি। গ্রামের সাধারণ মানুষ সরল সাধারণ গ্রামজীবন ছাড়িয়া শহরে চলিয়া আসিতেছে। পরিত্যাগ করিতেছে কৃষিকাজ ও গো-পালন। অন্যদিকে সস্তায় বেশি লাভ করিতে গিয়া ব্যাপক হারে রাসায়নিক সার প্রয়োগে জমি হারাইতেছে উর্বরা শক্তি। শস্য হইতে উধাও হইতেছে খাদ্যগুণ। খাদ্যদ্রব্যে বিষক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যাইতেছে নানা ধরনের মারণরোগ। বিষাক্ত হইতেছে পানীয় জল। বিষাক্ত হইতেছে মুক্ত বাতাস। ভূ-পৃষ্ঠে জলাভাব, ভূগর্ভের জলে দূষণ। বাড়িতেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবর্তিত হইতেছে ঋতুর সময়সীমা। সব মিলাইয়া এক ধবংসের পূর্বাভাষ। এই দুর্ভাবনা সাধারণ মানুষের মনে এতটাই উদ্বেগ সঞ্চার করিয়াছে যে, বৃক্ষকে রক্ষা করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়া এইবছর লক্ষ্ণৌয়ের সাধারণ মানুষ বৃক্ষে রাখী বন্ধন করিয়াছে।

গ্রামীণ বিকাশকে নির্বাচনী ইস্যু করিয়া যে রাজনৈতিক টোটকা ব্যবহার করা হইতেছে, তাহাতে গ্রামের বিশেষ কোনও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই, এযাবৎকাল ধরিয়া উন্নতি হয়ও নাই। উদাহরণ হিসাবে 'রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি যোজনা'র কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সরকারি কোষ হইতে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হইয়া যাইতেছে, অথচ গ্রামের মানুষ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে। বস্তুত, মা-মাটি-মানুষ আজ আক্রান্ত।

আজ আমাদের দেশের সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা রহিয়াছে, গোরু-গ্রাম-কৃষি ও পরিবেশ রক্ষা তাহার মধ্যে অন্যতম। ভারতে দীর্ঘমেয়াদী রাজত্ব করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ রাজশক্তি ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার মূল ভিত্তি গো-বংশ ধবংস করিবার চক্রান্ত করিয়াছিল। কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল আধার হইল ভারতীয় কৃষি। আজও ভারতের ৭০ ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করিয়া থাকে এবং তাহাদের প্রধান জীবিকা হইল কৃষি। আর এই কৃষি ব্যবস্থার মূল আধার ছিল গো-বংশ। ভারতীয়রা কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হিসাবে গোরুকে মা বলিয়া ডাকিয়া থাকে, পূজা করিয়া থাকে। গোরু শুধুমাত্র একটি দুগ্ধ দেওয়ার যন্ত্র নয়, গো-মূত্র হইতে বহুবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইত এবং এখনও হইতেছে। গোবর ও গো-মূত্র জৈব সার হিসাবে ভূমিকে উর্বর ও শস্যশ্যামলা করে। গোবর ইত্যাদি থেকে বায়ো-গ্যাস তৈরি করে আলো জ্বালানো, রান্নার গ্যাসও পাওয়া যাইতেছে। দুধ, দই, ঘি, গো-মূত্র ও গোবর অর্থাৎ পঞ্চ গব্য ভারতীয় সমাজের কাছে অমৃতস্বরূপ। এককথায় গো-জাতিকে ভারতীয় অর্থনীতিতে তাই গো-ধন বলা হইতেছে।

ভারতে বর্তমানে ২৬টি প্রজাতির গোরু এবং ৬টি প্রজাতির মহিষ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যত গোরু ও মহিষ আছে তাহার শতকরা ২২ ভাগ ভারতেই রহিয়াছে। ২০০১ সালের গণনা অনুযায়ী ভারতে প্রায় সাড়ে আটাশ কোটির মতো গবাদি পশুর হিসাব পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে গবাদি পশুর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। এই গো-ধন রক্ষা করিবার জন্য গো-হত্যা বন্ধের আইন থাকা সত্ত্বেও এই দেশে ৩৬ হাজার কসাইখানার মাধ্যমে প্রতিবছর ৩ কোটি গোরু হত্যা করা হইতেছে। প্রতিবছর প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখাইয়া (পড়ুন প্রশাসনিক মদতে) লক্ষ লক্ষ গোরু পাচার হইয়া বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য স্ফীত করিতেছে। মেকলের শিক্ষানীতি এবং ভোটব্যাঙ্ক সর্বস্ব তোষণের রাজনীতির কারণে গো-জাতি আজ ধবংসের পথে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই দেশের সাধু-সন্ত-মহাত্মারা এবং অনেক ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠন যে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার আয়োজন করিয়াছে, তাহা দেশের গো-সম্পদ বিনষ্টে বিদেশীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে এবং জাতীয় চেতনা জাগরণে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কেননা, গোরু-গ্রাম ও ভারত অভিন্ন। গোরু বাঁচিলে গ্রাম বাঁচিবে, গ্রাম বাঁচিলে ভারত বাঁচিবে, আর ভারত বাঁচিলে বিশ্বের মঙ্গল হইবে।

শুভ দীপাবলীর এই পুণ্য লগ্নে তাই সংকল্প হউক— ভারতকে জিতাইতে হইবে।

মা শক্তিরূপিণী মহাকালী

গোপাল চক্রবর্তী

বেদে শক্তিতত্ত্বের যে পরিচয় আমরা দেখতে পাই তার দ্বারা বলা যায় যে, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে শক্তিতত্ত্বের মূল ভাবগুলি কিঞ্চি দধিক বেদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে এটাও স্মরণীয় যে স্পষ্টরূপে বেদে কোথাও পরম তত্ত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত তন্ত্রসম্মত শক্তিতত্ত্বের ন্যায় কোনও তত্ত্বকে জগতের মূল উপাদান কারণরূপে উল্লেখ করা হয়নি। শক্তিতত্ত্বের যা কিছু পরিচয় বেদে পাওয়া যায়, তা কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ধারণারই সমষ্টি এবং এগুলি থেকে অবিচ্ছিন্ন কোনও ধারণা করা খুবই কঠিন।

তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে তন্ত্রের বেদাত্মতত্ত্বের কথা উক্ত হয়েছে। যেমন, কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে, ''তস্মাৎ বেদাত্মকং শাস্ত্রং বিধি-কৌলত্মকং প্রিয়ে।'' নিরুত্তর তন্ত্রে তন্ত্রকে পঞ্চ ম বেদ বলা হয়েছে। মনুসংহিতার বিখ্যাত টীকাকার কল্লুক ভট্ট বলেন, বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে শ্রুতি দ্বিবিধ— ''বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতি কীর্তিতাঃ।'' এই সকল উক্তি থেকে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের ন্যায় তন্ত্র বা আগমশাস্ত্রেরও বেদাত্মকত্বই প্রতিপাদিত হয়। বেদে প্রত্যক্ষভাবে শক্তিতত্ত্বের স্বরূপ যেভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে তদপেক্ষা পরোক্ষভাবেই শক্তির তন্ত্রসম্মত স্বরূপের অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখ্য হল— ঋগ্বেদের বাক্‌সূক্ত বা দেবীসূক্ত। এই সূক্তটিকে শাক্তাগমের মূলরূপে স্বীকার করা হয়।

শক্তির দশ প্রধান রূপভেদের অর্থাৎ দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালী প্রথমা। কালীর শান্ত ও উগ্র রূপের বর্ণনা বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুধর্মোত্তরে বর্ণিত ভদ্রকালীর রূপ সুন্দর ও শান্ত। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য, কারণাগম, চণ্ডীকল্প, ভবিষ্যপুরাণ, দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত কালী বা মহাকালী উগ্ররূপা। আজ মণ্ডপে মণ্ডপে চিন্ময়ী দেবী মৃণ্ময়ীরূপে অধিষ্ঠিতা। জনশ্রুতি আছে যে, আমাদের অতি পরিচিতা কালীমূর্তির প্রথম প্রচলন করেন প্রায় পাঁচ শতাধিক বর্ষ পূর্বে নবদ্বীপের বিখ্যাত শাক্ত পণ্ডিত, তন্ত্রসার গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তবে আগমবাগীশের পূর্ববর্তী কিছু কিছু গ্রন্থেও এই মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়।

মহাকাল সংহিতা অনুসারে দক্ষিণা কালীই আদ্যাকালী। দক্ষিণ দিকে যমের অবস্থান, কালী নামে ভীত হয়ে সে ছুটে পালায়। এই জন্যই ত্রিজগতে কালিকাদেবী দক্ষিণা নামে পরিচিতা। আবার স্বয়ং শিব বলেছেন, ''যজ্ঞাদি কর্মের শেষে দক্ষিণা যেমন যজ্ঞাদিকে সফল করে, তেমনি দেবী কালিকা সকলকে বাঞ্ছিত ফল এবং মুক্তি দেন বলে সেই বরবর্ণিনীকে দক্ষিণাকালী বলা হয়।'' আবার এও বলা হয় যে, দক্ষিণামূর্তি নামক ভৈরবের আরাধিতা বলে দেবীকে দক্ষিণাকালী বলা হয়।

দক্ষিণাকালী কৃষ্ণা। ধ্যানে তাঁকে মহামেঘপ্রভা শ্যামা এবং অঞ্জনাদ্রিনিভা বলা হয়েছে। কামাখ্যা তন্ত্রে আছে— কালী সদা কৃষ্ণবর্ণা। এটি আগমের নির্ণয়—

''কৃষ্ণবর্ণা সদাকালী আগমস্যেতি নির্ণয়ঃ।''

মহানির্বাণ তন্ত্রে আছে—

শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।

প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্বভূতানি শৈলজে।।

অতস্তস্যাঃ কালশক্তের্নির্গুর্ণায়া নিরাকৃতেঃ।

হিতায়াঃ প্রাপ্ত যোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিত।।

পরাশক্তি অরূপা, সুতরাং বর্ণহীন। যেখানে সর্ববর্ণের অভাব তাহাই নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ একথা বিজ্ঞানসম্মত। যে জ্যোতি আমাদের চক্ষু ধারণা করতে পারে না, তাই নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। তাই মহাজ্যোতি স্বরূপা কালী কৃষ্ণবর্ণা। কিন্তু জ্ঞাননেত্রে মহাজ্যোতি রূপে দৃশ্য হন।

কালী দিগম্বরী বা দিগ্‌বস্ত্রা। বস্ত্র আবরণ। সবচেয়ে সূক্ষ্ম আবরণ মায়া। কালী পূর্ণব্রহ্মময়ী বলে মায়াতীতা। কিন্তু জীবকোটিকে মায়াপাশে বদ্ধ করেন। তাঁর মুক্তকেশজাল মায়াপাশের প্রতীক। নিরুত্তর তন্ত্রে উক্ত আছে কালী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকেও মুক্তিপ্রদান করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে মুক্তি প্রদান করেন বলে তিনি মুক্তকেশী।

কোথাও বর্ণনা আছে যে, কালীর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাচ্ছে। এ সম্বন্ধে মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে— নিত্যা কালরূপা অব্যয়া শিবস্বরূপা কালীর ললাটে অমৃতত্বহেতু চন্দ্রকলা অঙ্কিত—

নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটে ইস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরুপিতম্।।

কালী ত্রিনয়না। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই সেই ত্রিগুণময়ী ত্রিকালদর্শিণী মায়ের নয়নপথে সর্বক্ষণ প্রতিভাত রয়েছে। ধ্যানান্তরে দেখতে পাওয়া যায়— 'বহ্ন্যর্কশশি নেত্রাঞ্চ রক্ত বিস্ফূরিতাণনাং।" মায়ের নয়নত্রয়ে বিশ্বের বহ্নি, সূর্য ও চন্দ্ররূপা তিনটি নয়ন সর্বক্ষণ উদ্ভাসিত রয়েছে। তা যথাক্রমে বিশ্বের তেজ বা দীপ্তিতে প্রথম, জ্যোতি বা প্রকাশে দ্বিতীয়, এবং শান্তি বা রূপে তৃতীয় ভাব প্রকাশ করছে। রক্তই জীবের শক্তিস্বরূপ, তাই তাঁর নয়নত্রয় শক্তি সহযোগে আরক্ত হয়ে উদ্দীপ্ত।

কালী করালবদনা— 'মহাকাল' সৃষ্টি থেকে চিরকাল ধরে সব কিছুই 'কলন' অর্থাৎ গ্রাস বা কালগ্রস্ত করছেন। সেই কারণে তিনি জগৎ সংহারক মহাকাল নামে অভিহিত হয়েছেন। মহাপ্রলয়কালে সেই মহাকালকেও যিনি গ্রাস করেন বা নিজ অঙ্গে লয় করে নেন। তিনিই করালবদনা কালী। করালবদন আবার তাঁর কঠোরতারও নিদর্শন। অসুরনাশিনী মায়ের মুখমণ্ডলে সেই আদি দেবাসুর যুদ্ধের স্বরূপ ঘোর সমরনিষ্ঠুরতাও প্রতিভাত হয়েছে। দেবীর করালবদনের ঘোরদন্তশ্রেণী তাঁর অবিশ্রান্ত লয়ক্রিয়ারই নিদর্শন। এই দন্তসমূহ দ্বারা আবার দেবীর লোলজিহ্বা সদা নিপীড়িত হচ্ছে। জিহ্বার অন্য নাম রসনা। রসনাই সকল রসগ্রহণের মুখ্যযন্ত্র। জীবের রসনাই যেন সর্বরসের জ্ঞানরূপ বিন্দুটি চ্যুত হয়ে বাসনা বা কামনাস্বরূপে কার্য করে। মা, সেই লোলজিহ্বা নিপীড়ন দ্বারাই সাধককে তাঁর সর্ববিধ লালসা সংযমেরই ইঙ্গিত করেছেন।

মা বিগলিতরুধির গণ্ড। রক্তধারা রজোগুণ। মা রজোরহিতা শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা বিরজা এবং মুণ্ডমালাবিভূষণা। যোগবশিষ্ঠের নির্বাণপ্রকরণ এবং কর্পুরাদিস্তুতির টীকাকাররা বলেন, আগামী সৃষ্টির জন্য পূর্বসৃষ্টির সংস্কার মূলমায়াতে মালা করা হয়েছে। আবার তন্ত্র বলছেন, "পঞ্চাশৎ বর্ণ মুণ্ডালী।" শব্দ ছাড়া অর্থের অভিব্যক্তি হয় না। শব্দের সার স্বর ও ব্যাঞ্জন। স্থূল অর্থ বা প্রত্যয় যখন নাশ হয়, তখন সূক্ষ্ম স্বর ব্যাঞ্জন সংস্কার প্রকৃতিকে আশ্রয় করে থাকে। আর মুণ্ডমালা হলো তার কোটি কোটি বিভূতি শক্তি।

জগজ্জননী কালী পীনোন্নত পয়োধরা। এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব পালনকর্ত্রী দেবী স্তন্যরূপে অন্নাদি দিয়ে ত্রিজগৎ পালন করছেন।

মহাকালী পূর্ণরূপা। তিনি মহাকাশরূপিণী। কেননা, মহাকাশ ব্রহ্ম আর কালীও ব্রহ্ম। মহাকাশকে পূর্ণবৃত্ত কল্পনা করা হয়। এই বৃত্তের চারভাগ চার ভূজ। তাই দেবী চতুর্ভূজা। দেবীর বামদিকের উপরের হাতে খড়্গ আর নীচের হাতে ছিন্নমুণ্ড। দেবী জ্ঞান খড়্গের দ্বারা নিষ্কাম সাধকদের মোহপাশ ছিন্ন করেন। তত্ত্বজ্ঞানের আধার মস্তক। দেবী অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বিশ্বকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। দেবীর হস্তস্থিত নৃমুণ্ড এই তত্ত্ব সূচিত করছে। দেবীর ডানদিকের ওপরের হাতে অভয়মুদ্রা এবং নীচের হাতে বরমুদ্রা। এর অর্থ, দেবী সকাম সাধককে অভয় এবং অভীষ্ট প্রদান করেন। গুপ্ত সাধনতন্ত্রে উল্লেখিত আছে—

আলীঢ়ং বামপাদন্তু প্রত্যালীরন্তু দক্ষিণম্।
আলীরপদা সা দেবী প্রত্যালীঢ়া ক্ষণে ক্ষণে।
অনন্ত রূপিণীং শ্যামাং কো বক্তুং শক্যতে প্রিয়ে।।

এক পা অতীতে এবং এক পা ভবিষ্যতে রেখে কালের অধিষ্ঠাত্রী কালী দাঁড়িয়ে আছেন, আলীঢ় বা প্রত্যালীঢ় পদা দেবীর এই তাৎপর্য।

কালীর কটিদেশে শবহস্তনির্মিত কাঞ্চী। হাত মানুষের প্রধান কর্মসাধন অর্থাৎ কাজ করার যন্ত্র। এই জন্যই মানুষের প্রধান কর্মসাধনভূত হস্তসমূহের দ্বারা নির্মিত কাঞ্চী বিরাট রূপিণী মহাদেবীর গর্ভধারণযোগ্য নিম্নোদর তথা কটিদেশে কল্পিত হয়েছে।

কালী শবরূপী শিবের বক্ষোপরি অবস্থিতা। শব নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক। গায়ন্ত্রীতন্ত্রে বলা হয়েছে—

শব ইত্যক্ষরে ব্রহ্মবাচকঃ প্রেতনির্ণয়ঃ।

সুষুম্নামার্গস্থা কুণ্ডলিনীকে শ্মশানবাসিনী বলা যায়। কাজেই কুণ্ডলিনী অর্থাৎ কালী শ্মশানবাসিনী। এই মহাশক্তিরূপিণী মহাকালীর মূর্তির রহস্য।

যুগে যুগে এই মহাশক্তি অশুভশক্তির হাত থেকে শুভশক্তিকে রক্ষা করে এসেছেন। আজও দিকে দিকে অশুভ শক্তির তাণ্ডব। ক্রমবর্ধমান আসুরিক শক্তি প্রতিনিয়ত কেড়ে নিচ্ছে অসহায় মানুষের প্রাণ। ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে সভ্যতার ইতিহাস। লাঞ্ছিত হচ্ছে মানবতা। আজ এই পুণ্যলগ্নে মহাশক্তির কাছে আমাদের সমবেত প্রার্থনা— হে মা, জগজ্জননী, মহাশক্তি, তুমি সকল অশুভ শক্তিকে পদদলিত করো। আসুরিক শক্তির বিনাশ করো, শরণাগতকে রক্ষা করো।

দীপান্বিতা শ্যামাপূজার কাল

স্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী

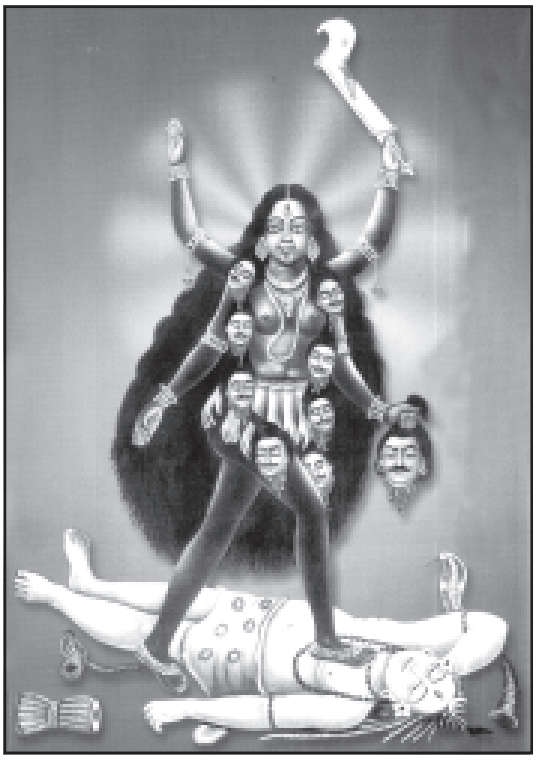

১৪১৬ সালে শ্যামাপূজার দিন নিরূপিত হয়েছে ৩০ আশ্বিন শনিবার। কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ব্যতীত অন্যান্য পঞ্জিকা মতে ৩১ আশ্বিন রবিবার সংক্রান্তি। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মতে সূর্য তুলা রাশিতে সংক্রমণ করছেন দিবা ১১ টার পর। অন্যান্য পঞ্জিকা মতে সূর্যের তুলা রাশিতে সংক্রমণের কাল রাত্রি ১২-৪১-এর পর। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসরণকারীদের কোনও সমস্যা নাই। অন্যান্য পঞ্জিকা যাঁরা অনুসরণ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। শ্যামাপূজা আগমশাস্ত্রোক্ত। মলমাতত্ত্ব টীকাকার ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় বলেছেন-'আগমোক্তানি কর্মাণি সৌরেণৈব বিনির্দ্দিশেৎ'। বচনানুসারে অভিলাপ বাক্যে সৌরমাস উল্লেখ্য, 'এবং যুগে যুগে প্রোক্তঃ কলৌ সৌরশ্চ সর্বতঃ যোগিনীতন্ত্র,' সুতরাং সংকল্প বাক্যে সৌরমাস উল্লেখ করণীয়। অন্যান্য বহুবিধ তন্ত্রেও কার্তিক মাস এবং তুলা রাশি উল্লেখের কথা বলা হয়েছে। যথা---কার্তিকেতু বিশেষেণ অমাবস্যা নিশার্দ্ধকে। তস্যাং সম্পূজয়েদ্দেবীং অমাবস্যা নিশার্দ্ধকে। কামাখ্যা তন্ত্রে— কার্তিকে কৃষ্ণপক্ষেতু পঞ্চ দশ্যাং মহানিশি, আবির্ভূতা মহাকালী যোগিনী কোটিভিঃসহ— বিশ্বসার তন্ত্র, তুলাদিত্যে নিশার্দ্ধেতু পঞ্চ দশ্যাং নগাত্মজে। কালিকাং পূজয়েৎ তত্র প্রচণ্ডাং মুণ্ডমালিনীম্— মুণ্ডমালাতন্ত্র। তুলার্কে যস্ত্বমাবস্যা নিশার্দ্ধে ঘোর দক্ষিণাম্। পূজয়েৎ বিধিবদ্ভক্ত্যা সর্বসিদ্ধিশ্বরো ভবেৎ।।--- ব্যোমকেশ সংহিতা। কালীতন্ত্রে বলা হয়েছে---'তুলার্কে বহুলে পক্ষে পঞ্চ দশ্যাং মহেশ্বরীম্। যথোপচারৈঃ সম্পূজ্য মহানিশি নৃপো ভবেৎ'।। শরৎকালে চ দেবেশি দীপ যাত্রা দিনেহপি চ। অমাবস্যাং সমাসাদ্য মধ্যরাত্রৌ বিচক্ষণঃ— উত্তর কামাখ্যা তন্ত্র। এখানেই কেবল শরৎকালের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং প্রমাণ নিচয়ে সংকল্প বাক্যে সৌর কার্ত্তিক মাসের প্রাধান্য দেখা যায়। বিধিবাক্যানুসারে সৌরমাস উল্লেখ করলেই রাশি উল্লেখ করতে হয়। "সংকল্প বাক্যে তু কার্তিকে মাসীত্যুল্লেখ্যং। ন তু রাশ্যুল্লেখোহপি। গৌণ চান্দ্রেন তদ্বিধানাৎ'— শব্দ কল্পদ্রুম। এই প্রমাণানুসারে সূর্য সংক্রমণ ব্যতীত সংকল্প করা যাইবে, শ্যামাপূজার নির্দিষ্ট দিনে গৌণ চান্দ্র কার্তিক। তন্ত্রোক্ত পূজার ৩টি ভাব— পশু, বীর ও দিব্য ভাব। পশুভাব যথা---পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ। ন শূদ্রঃ দর্শনং কুর্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ।। বীরভাব যথা---জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী নিত্যানুষ্ঠান তৎপরঃ। কামাদি বলিদানশ্চ স বীরঃ ইতি গীয়তে।। দিব্যভাব যথা---দিব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা, দ্বন্দ্বাতীতো বীতরাগঃ সর্বভূত সমক্ষমী।। বর্তমানে শ্যামাপূজা দুইভাবে অনুষ্ঠিত হয়— পশু ও বীরভাব। দুইভাবে পূজার কাল সম্পর্কে শাস্ত্র নির্ণয় হয়—নিশা অর্থাৎ রাত্রিকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিশা, মহানিশা ও অতিনিশা। 'নিশা তু পরমেশানি সূর্যে চাস্তমুপাগতে। প্রহরে চ গতে রাত্রৌ ঘটিকে দ্বেপরে চ যে।। মহানিশা সমাখ্যাতা ততশ্চাতি মহানিশা। অর্ধরাত্রিগতে দেবি পশুভাবো ন পূজয়েৎ।। তন্ত্রকোবিদ অন্নদাপ্রসাদ কবিভূষণ বলেছেন, "যত্র পূর্বদিনে অর্দ্ধরাত্রাৎ পরমমাবস্যা পরদিনে অর্দ্ধরাত্রাৎ পূর্বমেব, তত্র পশুভাবিনঃ পরদিনে, দিব্যবীরয়োশ্চ পূর্বদিনে পূজা কার্যা ইতি। সুতরাং যাঁরা পঞ্চ তত্ত্ববিহীন অর্থাৎ পশুভাবে মহামায়া আদ্যাশক্তির অর্চনা করিবেন তাঁদের পক্ষে রাত্রির পূর্বার্দ্ধে করতে বিশেষ কোনও সমস্যা থাকছেনা। তাঁরা গৌণ চান্দ্র মাস উল্লেখ পূর্বক রাশি উল্লেখ না করে সংকল্প করে মহামায়ার পূজা করলে শাস্ত্রীয় বিশেষ সমস্যা থাকছে না। কিন্তু বীরাচারীদের রাত্রি ১২-৪১টা এর পর অবশ্যই রশি উল্লেখ পূর্বক সংকল্প করে মহামায়ার অর্চনা করতে হবে।

পাশ্চাত্যের বিকাশের ভ্রান্ত ধারণা থেকে আমাদের বাঁচতে হবে

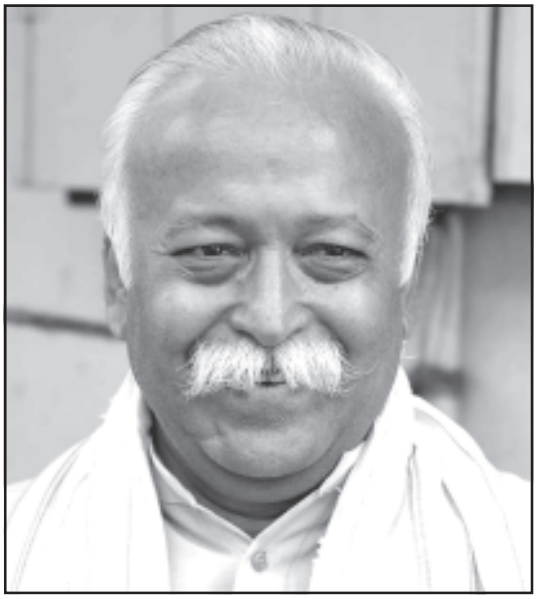

মোহনরাও ভাগবত

পাশ্চাত্য কাল গণনানুসারে এই দিনে (২৭ সেপ্টেম্বর) আজ থেকে ৮৪ বছর আগে সঙ্ঘের হিন্দু সমাজ সংগঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। হিন্দু সমাজের সংগঠন একটা অনিবার্য রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। এটা বেশি বোঝানোর প্রয়োজন নেই। তাতে কেউ হিন্দুত্ব বা হিন্দু শব্দের ব্যবহার করুন বা না করুন। হিন্দুস্থানের প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ের গভীরে এই ভাব সুপ্ত, জাগ্রত কিন্তু অব্যক্ত অথবা ব্যক্ত---এই তিনটির মধ্যে কোনও না কোনও অবস্থায় পাওয়া যায়। সহজেই তা প্রকটিত হয়। হিন্দু শব্দ কোনও পূজা পদ্ধতি, ভাষা, প্রদেশ বিশেষ, মত বিশেষকে চিহ্নিত করে না। কিন্তু সকল মত-পন্থ-ভাষা-প্রান্তের পক্ষের সম্মান করে, স্বীকার করে। সকলকে নিয়ে মিলেমিশে থাকার রীতি শিক্ষাদানকারী ভারতে প্রবহমান সংস্কৃতির জীবন পদ্ধতির নাম হিন্দুত্ব---একথা আমাদের সর্বোচ্চ আদালতও বলে দিয়েছেন। বিবিধতার মধ্যে একতার অনুভব করে সকলকে নিয়ে চলা, চালানো এবং বিশ্বের জীবনকে সমৃদ্ধ, শান্তিময় ও সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রেরণাদাতা---এটাই একমাত্র ভাবনা, একমাত্র সংস্কৃতি।

সারা পৃথিবীতে আজ এই ভাবনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বৈষম্য ও বিভেদমূলক দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে গঠিত ব্যবস্থাগুলির প্রয়োগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। দৃষ্টিকোণের ত্রুটির কারণে উদ্দেশ্য ভালো হলেও ফল পাওয়া যায় না। এজন্যে সম্পূর্ণ বিশ্বকে আপন করে ভাবার, একাত্ম (Integral) ও বিশুদ্ধ (Holistic) দৃষ্টিকোণের জন্য ভারতের দিকে সকলে আশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষাকারী এই ধর্মকে ঈশ্বর প্রদত্ত কর্তব্য হিসাবে সময়ে সময়ে নিজের উদাহরণের মাধ্যমে বিশ্বকে শিক্ষাদানকারী ভারত আজকের জগতে অত্যাবশক হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু দেশের বর্তমান পরিস্থিতি মনোস্থিতি ও নীতিগুলিকে লক্ষ্য করলে আমাদের অবস্থান ও গতি-প্রকৃতি (Speed) নিয়েই প্রশ্ন দেখা দেয়।

অতি সাধারণ মানুষের মনেও আমাদের দেশের সুরক্ষা বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমাদের সঙ্গে পাকিস্তান ও চীনের ব্যবহার তথা তাদের আসল উদ্দেশ্যে সম্পর্কে সকলেই ভালোভাবে জানে। বাংলাদেশও আমাদের অনেক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এশিয়া মহাদেশে আমাদের কল্যাণের নামে আমেরিকা দু-রকম খেলা খেলছে। নেপাল, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশগুলিকে শীঘ্রাতিশীঘ্র নিজের প্রভাবে আনার জন্য তারা চেষ্টা চালাচ্ছে। ১৯৬২-তে চীনের ভারত আক্রমণের ফলে হারানো লাদাখ, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশের ভারতীয় ভূমির প্রত্যেক ইঞ্চি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের সংসদ সংকল্প নিয়েছিল। কিন্তু চীন চারদিকের দেশগুলিতে তার প্রভাব বাড়িয়ে ভারতকে ঘেরাটোপে বন্দী করতে প্রায় সফল। একথা ঠিক, স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের উপর বার বার চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ তথা সীমান্ত অতিক্রমণের ঘটনা থেকে কম বেশি শিক্ষা নিয়ে আমরা সামরিক শক্তিকে পূর্ণ সতর্ক রেখেছি এবং উদাসীনতাকে কিছু মাত্রায় ত্যাগ করেছি। কিন্তু এখনও আমাদের সামরিক প্রস্তুতি চীনের থেকে অনেক কম। তাই আমাদের সীমার সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা আবশ্যক। আমাদের অরক্ষিত সীমানার মধ্য দিয়ে নিরন্তর চলতে থাকা অনুপ্রবেশকে এখনই কঠোরতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। প্রথমেই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা, নাম বাতিল করা এবং ফেরত পাঠানোর নীতি (Detect, Delete, Deport) অবলম্বন করা চাই। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমাদের দেশের স্পষ্ট দূরগামী লক্ষ্য (ভিশন) মনে রেখে তার পূর্তির জন্য এগিয়ে চলার কাজ আমরা করিনি। ফলে চীনের কাছে একবার এবং

পাকিস্তানের কাছে বারবার ধোঁকা খাওয়ার পরেও আমাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা, অসাবধানতা ও অদূরদর্শিতা যেমনকার তেমন বজায় রয়েছে। বেশিমাত্রায় শোনা যাচ্ছে। কিছুদিন আগে থেকে বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশকে আমাদের খুব ভালো বন্ধু করা এবং শুধু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকেই নয়, সারা বিশ্বকে এক সর্বকল্যাণকারী আদর্শ নেতৃত্ব দেওয়ার মহান আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমাদের এগিয়ে চলার পরিকল্পনা করা উচিত ছিল। কিন্তু তা তো দূরের কথা, বরং আমাদেরই ভূমিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে ষড়যন্ত্র চলছে তা এখন ব্যর্থ করতে পারলেই যথেষ্ট---এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

"ভারতের অবিভাজ্য অঙ্গ পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে মুক্ত করে পুনরায় বাকী দেশের সঙ্গে সংযুক্ত করাই হবে সমস্যার পরিসমাপ্তি"---এই প্রস্তাব সারা দেশের সাংসদদের দ্বারা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়ে অনেক বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু সমস্যা তো কমেনি, বরং আরও বেড়ে চলেছে এবং আমরা সময় কাটিয়ে দিচ্ছি। অমরনাথ আন্দোলনের কারণে দেশের অখণ্ডতা ও একাত্মতার আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে জোর দেওয়ার বদলে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য সরকারের তরফে দেশবিরোধী নীতিরই পৃষ্টপোষকতা করা হচ্ছে। জম্মু ও লাদাখের মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার কেবল তাদের মনোবল, পুরুষার্থ ও একতার উপর নির্ভরশীল----কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কারণে নয়---এই অবস্থা কারোর পক্ষেই হিতকর নয়। কাশ্মীর উপত্যকায় দেশভক্তির ভাবনাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই দৃষ্টিতে কাশ্মীরের উদ্বাস্তু হিন্দুরা ফিরে গিয়ে উপত্যকায় বিপর্যস্ত জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা ঠিক করতে পারে এরকম ব্যবস্থা চাই। বিতাড়িত হিন্দুদের ফিরে যাওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে— এরকম ভ্রান্ত ঘোষণাতে কাজ হবে না। ভারতভক্ত ও হিন্দুধর্মাবলম্বীরা নিজেদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও সরকারের দ্বারা আশ্বাসিত হয়ে সম্মানপূর্বক স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যে ন্যায়-সঙ্গত দাবী জানিয়েছেন তা অবিলম্বে পূর্ণ হওয়া চাই। ইতিমধ্যে দেশভক্তি ও ধর্মভক্তির কারণে আমাদের দেশে উদ্বাস্তুদের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তাঁদের ত্রাণ কাজের জন্য গৃহীত যোজনাগুলির পূর্ণ তথ্যাবলী দেওয়া চাই। সেইসঙ্গে উপত্যকার চলতি সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের আস্থা অর্জন করা চাই।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলি খোলাখুলি খেলা করছে। আদালতের আদেশ ও গুপ্তচর বিভাগের সতর্কবাণী সত্ত্বেও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সেখানে এবং বাকী সারা দেশে বাধা দেওয়ার কোনও মজবুত নীতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। ভোট রাজনীতির চাপে রাষ্ট্রহিতকে উপেক্ষা করার জন্য যে মূল্য দিতে হচ্ছে, তা আর কত দিন আমরা সহ্য করবো? সম্প্রতি উত্তর কাছাড় ক্ষেত্রে ডিমাসা ও জিমি নাগা বন্ধুদের নিজেদের মধ্যে লড়াই-এর কারণে নৃশংস রক্তপাত হয়ে গেল। তার পিছনে উগ্রপন্থী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিদেশ পোষিত ধর্মান্তরকারীদের ভোট লোভী জঘন্য মনোবৃত্তিকে মদত দেওয়া হচ্ছে। দেশের ভিতরে তথাকথিত দেশীয় মাওবাদী ও জেহাদী উগ্রবাদ থেকে শুরু করে সীমা প্রান্তে উগ্রবাদ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই রাষ্টবিরোধী শক্তির সঙ্গে আই এস আই সহ অন্যান্য বিদেশি সাহায্যকারী সংস্থা জোট বেঁধে কাজ করছে, এটা সরকারের স্পষ্ট জানা আছে। তবুও ফলপ্রসূ কোনও নীতি (শুধুমাত্র ভাষণ ও ঘোষণা ছাড়া) নেওয়া হচ্ছে না। নিম্নলিখিত পাঁচ সূত্রের ভিত্তিতে রচিত যোজনার তাই খুব তাড়াতাড়ি রূপায়ণ আবশ্যক।

হিন্দুত্ব সবাইকে নিজের মনে করে ও কারোরই বিরোধিতা করে না। এজন্যেই হিন্দুসমাজের সাধারণ স্বভাব সহিষ্ণুতা। কিন্তু উদারতা, অহিংসা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা শেখানোর সংস্কৃতি, দেব-দেবী পরম্পরা প্রভৃতি বিশ্বের একেশ্বরবাদী তথা কট্টর প্রবৃত্তির দ্বারা উপহাস ও আক্রমণের শিকার হতে চলেছে। হিন্দুত্ব অর্থাৎ জাতীয় ও মানবীয় মূল্যবোধগুলির রক্ষাকর্তা হিসাবে হিন্দুসমাজকে ভেদভাব থেকে ওপরে উঠতে হবে।

(১) উগ্রপন্থী গতিবিধিকে সরকার ও প্রশাসনের দ্বারা একযোগে কঠোরতাপূর্বক দমন।

(২) নিরাপত্তা বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি।

(৩) সংবাদ সংগ্রহ তথা গুপ্তচর বিভাগকে শক্তিশালী করা।

(৪) সমাজের সুরক্ষার দৃষ্টিতে ব্যাপক জনজাগরণ ও প্রশিক্ষণ।

(৫) বেকারত্ব, শোষণ ও ভ্রষ্টাচার থেকে শীঘ্র মুক্তি।

পঞ্চম সূত্রের কথা বললে বিকাশের কথা এসে যায়। বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে শীঘ্র বিকাশ করে আর্থিক ক্ষেত্রে মহাশক্তিধর হতে পারে এরকম দেশগুলির মধ্যে ভারতের নামও আজ উচ্চারিত হচ্ছে। আমাদের ব্যবসায়ী, কৃষক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের কর্তৃত্ব সকলেই মানেন। কিন্তু বিকাশের পাশ্চাত্য ধারণা ও পথ তাঁদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটা পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের কাছেই আমরা শুনেছি। Industrialise or Perish-এর স্থিতি থেকে

Industrialise and Perish-এর স্থিতিতে তারা পৌঁছে গেছে। ওদের ভ্রান্তি থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। আমাদের একাত্ম, সমগ্র ও মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে ভারতের জন্য আলাদা বিশিষ্ট বিকাশের ধারণা, উদ্দেশ্য ও উপায়ের পথ তৈরি করতে হবে। ভারত আজও কৃষিপ্রধান দেশ। অথচ বাজেটের কত শতাংশ কৃষিতে খরচ হয়? কৃষকদের মধ্যে ৬০ শতাংশ অল্পসিঞ্চিত ও অসিঞ্চি ত ভূমির ওপর চাষ করে। তাঁদের জন্য কতটা ভর্তুকির ব্যবস্থা (Subsidy) আছে? কৃষকদের একটা বড় অংশ অল্প ও মাঝারি পরিমাণ জমির মালিক; তাদের জন্য কি পরিকল্পনা করা হয়েছে? বিশ্বের অন্নদাতা ভারতীয় কৃষকরা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত কেন নিচ্ছেন? সকলেই বলেন যে, খাদ্য পণ্যের দাম বাড়ছে। কৃষির সঙ্গে গোপালন, পশুপালন বন্ধ হয়ে গেছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদিত খরচের ভিত্তিতে মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না।

শহরকেন্দ্রিক বিকাশের কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আমাদের বিকাশের রাস্তা বদলাতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের (WHO) õ= নাপূর্ণ নীতির চক্রব্যূহ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের খাদ্যশস্য সুরক্ষার ব্যবস্থাকে সংকটে ফেলার জন্য বহুজাতিক বীজ কোম্পানিগুলির অনাবশ্যক শর্ত দেওয়ার নীতিগুলি ত্যাগ করতে হবে। চাষযোগ্য কৃষি জমিতে অনুপযুক্ত কৃষিপদ্ধ তি ছাড়তে হবে। কৃষির জন্য উপযুক্ত জমিকে সেজ (SEZ) থেকে বাঁচাতে হবে অথবা সেজ (SEZ) থেকেই বাঁচতে হবে। কৃষিতে আমাদের পরম্পরাগত পদ্ধ তির অনেক উপযোগিতা আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারেও যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে তথা অনেক দেশে প্রত্যক্ষ ব্যবহারেও আনা হয়েছে। গো-আধারিত কৃষি ও গো-উৎপাদিত দ্রব্যাদি মানুষের জন্য যে উপকারী ও ভেষজ গুণ সমন্বিত তা প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের নিজেদের ক্ষমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত যুগপোযোগী পদ্ধ তির আবিষ্কার ও প্রচার করতে হবে।

শিক্ষায় স্বাভিমানবোধ জাগ্রতকারী আত্মগৌরব ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানো চাই। শিক্ষা আমাদের নিজেদের হাতে চাই। শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ হচ্ছে। ফলে ব্যয়বহুলও হচ্ছে। সুরক্ষা, অর্থ ও শিক্ষানীতি জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন হলে দেশ এক পরম বৈভবশালী রাষ্ট্ররূপে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় অস্মিতা বা জাতীয় পরিচিতি (ন্যাশনাল আইডেনটিটি) সম্পর্কে স্পষ্ট কল্পনা সমাজের সামনে সুস্পষ্টরূপে রাখতে হবে। এটা করা যাঁদের কর্তব্য তাঁদের অধিকাংশই ভোটের রাজনীতিতে আশ্রয় নিয়ে বিপরীতাচারণ করছে। স্বাভিমানবোধকে প্রতারিত করছে। ভোটের লোভে প্রান্ত ও ভাষার ভেদের ঊর্ধে ওঠার নীতি নিতে দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য সম্প্রতি কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে মিলে মহান সন্ত থিরুভাল্লুভার প্রতিমা ব্যাঙ্গালোরে ও মহান সন্ত সারভাঙ্গার প্রতিমা চেন্নাইতে স্থাপিত করার সুস্থ উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই ধরনের আচরণ আমাদের দেশের রাজনীতিকদের কাছ থেকে আশা করার জন্য আমাদের নির্বাচন পদ্ধ তিতে পরিবর্তনের আবশ্যকতাও সকলে অনুভব করতে পারছেন। একথা স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ত্তি উপলক্ষে সংসদে চর্চা হয়েছিল এবং তারপর বিভিন্ন প্রসঙ্গে স্পষ্ট হয়েছিল। এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া চাই। স্বাভিমানবোধ, সংস্কৃতি প্রভৃতি সমাজের আচরণেই সুরক্ষিত থাকে। অতএব সমাজের একতা, সদ্‌ভাবনা, স্বাভিমান প্রভৃতির সুরক্ষা ও সংবর্ধনকারী নীতিগুলিও নেতাদের আচরণে প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক।

হিন্দুত্ব সবাইকে নিজের মনে করে ও কারোরই বিরোধিতা করে না। এজন্যেই হিন্দুসমাজের সাধারণ স্বভাব সহিষ্ণুতা। কিন্তু উদারতা, অহিংসা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা শেখানোর সংস্কৃতি, দেব-দেবী পরম্পরা প্রভৃতি বিশ্বের একেশ্বরবাদী তথা কট্টর প্রবৃত্তির দ্বারা উপহাস ও আক্রমণের শিকার হতে চলেছে। হিন্দুত্ব অর্থাৎ জাতীয় ও মানবীয় মূল্যবোধগুলির রক্ষাকর্তা হিসাবে হিন্দুসমাজকে ভেদভাব থেকে ওপরে উঠতে হবে। লোভ, বলপ্রয়োগ অথবা ছল কপটতার দ্বারা ধর্মান্তরিত করে এই রাষ্ট্রীয়তার পরিবর্তন করা হচ্ছে। ভোটের লোভে শাসকশ্রেণী ও রাজনৈতিক নেতারা হিন্দুত্ব ও হিন্দু সমাজকে অবহেলা করছে। রাষ্ট্র দেশবিরোধী শক্তিগুলির হাতের খেলা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। দেশের রাজনীতি, রাজনৈতিক পদ্ধ তি ও রাজনৈতিক নেতাদের জাতীয়তাবোধ, সুরক্ষা, একাত্মতার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। রাষ্ট্রবিঘাতক শক্তিগুলির মদতকারী যেন না হয়। সমাজের শেষ ব্যক্তিটির পর্যন্ত আবশ্যক চাহিদা ও ব্যথা-বেদনার প্রতি সমব্যথী ও সংবেদনশীল হওয়ার প্রয়োজন আছে।

কিন্তু গণতন্ত্রে এই কাজ অন্ততপক্ষে সজ্জন শক্তির অনুসরণকারী সংগঠিত সমাজকেই করতে হবে। এজন্য সমাজে ব্যক্তি ব্যক্তির হৃদয়ে দেশভক্তি, দায়বদ্ধ তা, অনুশাসন, সঙ্ঘবদ্ধ তা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী জাগ্রত করে দেশের জন্য ২৪ ঘণ্টা সজাগ ও সক্রিয় থাকার আবশ্যকতা রয়েছে। সঙেঘর পাশে শাখারূপ একটা তন্ত্র বা পদ্ধ তি আছে। পরিস্থিতির ওপর বিজয়ের এটাই একমাত্র রাস্তা এবং পরিস্থিতির ওপর বিজয় আমরা সকলেই চাই। বিশ্বের অস্তিত্বের জন্যও ভারতের আবশ্যকতা অনিবার্য। দানবতার ওপর মানবতার বিজয়ের এই উৎসব উপলক্ষে আমরা এই উপায়ের অনুসরণ করব। এটাই আহ্বান।

(নাগপুরের বিজয়া দশমী উৎসবে পরম পূজনীয় সরসঙঘচালক মাননীয় শ্রীমোহন ভাগবতের ভাষণের সারাংশ)

গোমাতা বন্দনা

শিবাশিস্ দন্ড

জয় জয় গাভীমাতা
তোমারই মাহাত্ম্য-কথা
মহাশাস্ত্র ঋগ্বেদে
বর্ণিত হয়েছে তোমার
দেব-দেবী মুনি-ঋষির
মাগো তুমি মানবের
পঞ্চ মুখে পঞ্চ জনে
জয় জয় ভগবতী
দেবলোক থেকে ধেণু
পণিঃ আদি অসুরেরা
অন্ধকারে রুদ্ধ দ্বারে
লুব্ধ তারা দুগ্ধধারায়
স্বর্গলোকে শোকের ছায়া
গোধন ছাড়া স্বজন হারা
দেবরাজ ইন্দ্র তখন
দেবকুকুরী সরমা-কে
কোথায় আছে ধেনু আমার
নইলে ক্ষতি হবে অতি
সরমা পাতাইলো মিতা
বুদ্ধি বলে গোমাতার
মরুৎ-দের সঙ্গে নিয়ে
ধরাশায়ী হল যত
ঊষা এসে অবশেষে
বন্দিনী নন্দিনীমাতা
পঞ্চ মুখে পঞ্চ জনে

জয় মা ধবলী
পঞ্চ মুখে বলি।
দেখি বারংবার
মহিমা অপার।
অতি প্রিয় ধন
পরম আপন।
তাই গুণ গাই
কৃপা যেন পাই।।
করিয়া হরণ-ই
হল মহাধনী।
বন্দি করে তাঁকে
মুগ্ধ হয়ে থাকে।
দুখের ঘনঘোর
বেদনা কাতর।
ভেবে বারংবার
দিলেন মহাভার।
কর হে সন্ধান
যাবে যশ ও মান।
অসুরদেরই সাথে
সন্ধানপাইলো তাতে।
এলেন ইন্দ্ররাজ
অসুর ধড়িবাজ।
ঘোচায় অন্ধকার
হলেন যে উদ্ধার।
তাই গুণ গাই

জয় জয় ভগবতী
সর্বলোকে সর্বজনে
পরম সম্পদরূপী
সুধাভরা দুগ্ধধারা
রুগ্ন দেহ সুস্থ করে
সুরভী কামধেনু তুমি
শুভ শুভ মহাশুভ
দুগ্ধ-দধি-ঘৃত আর
পঞ্চ গব্যে পূর্ণ হয়
মুনি-ঋষি-রাজাগণ
তোমারই আকাঙ্ক্ষাতে
তুমি মাগো 'পবিত্রতা'
তোমার কৃপায় মানবজগৎ
পঞ্চ মুখে পঞ্চ জনে
জয় জয় ভগবতী
'গো' অর্থে 'গাভী' হয়
'গো' অর্থে 'ইন্দ্র'
গোকুলে গোপীর সখা
গোঠেতে চরান ধেনু
বিশ্বভরা দৃশ্যময়
তোমার অবদান মাগো
তুমি মাতৃ তুমি ধাত্রী
'গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা'
পঞ্চ মুখে পঞ্চ জনে
জয় জয় ভগবতী

কৃপা যেন পাই।।
করিয়া প্রসন্ন
মাগো তুমি ধন্য।
অমৃত সমান
শক্তি অফুরান।
অভিষ্টদায়িনী
তব কন্ঠধ্বনি।
গোময়-গোচনা
দৈব আরাধনা।
লভিতে আরোগ্য
করেন মহাযজ্ঞ।
তুমিই পরিত্রাণ
ধারণ করে প্রাণ।
তাই গুণ গাই
কৃপা যেন পাই।।
'গো' অর্থে 'ধরা'
আবার সর্বতাপ হরা।
গোপাল নন্দলাল
দেখেন মহাকাল।
শস্য-শ্যামলিমা
তোমারই মহিমা।
তুমিই পরমধন
জেনো সর্বজন।
তাই গুণ গাই
কৃপা যেন পাই।।

গোরু নিয়ে দলাদলি

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

গো-সংরক্ষণের বিষয়টা আমাদের রাজনীতিতে একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কাছে গোরু দেবী হিসেবে পূজিত। অথচ অন্য অনেকের কাছে গোরু খাদ্য। তার ফলে বিষয়টা ধর্ম ও রাজনীতিকে একত্রিত করে ফেলেছে। মন্দিরের সামনে গো-হত্যা নিয়ে মাঝে মাঝেই দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয়, জড়িয়ে পড়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ধর্মীয় আবেগের ব্যাপারগুলোও।

আমাদের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে যে নির্দেশমূলক নীতিগুলো আছে, তার অন্যতম হল গো-সংরক্ষণের বিষয়। ৪৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র গাভী, গো-বংশ ইত্যাদিকে সংরক্ষণ করতে এবং এই ধরনের দুগ্ধবতী ও ভারবাহী পশুহত্যা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেবে — 'shall in particular, take steps for preserving and improving breads and prohibiting the slaughter of cows and calvas and other nailch and draught cattle.'

অবশ্যই এই অধ্যায়টাই বলবৎযোগ্য নয় — অর্থাৎ এই ধরনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। কিন্তু সংবিধানের ৩৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে — এগুলোকে রাষ্ট্র উপেক্ষা করতে পারবে না, কারণ এগুলোই হল রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি, এবং সেই কারণে রাষ্ট্র এগুলোকে আইনগতভাবে রূপ দেবে — 'are nevertheless fundamentals in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws.'

এই কারণে সংবিধানের মুখ্য রচয়িতা ডঃ বি আর আম্বেদকর বলেছিলেন — এই নীতিগুলোর একটা নৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্য আছে— বিশেষ করে, সরকার এক্ষেত্রে গাফিলতি দেখালে জনমত তাকে পরিত্যাগ করবে।

অবশ্য গণপরিষদে এই অনুচ্ছেদটা নিয়ে বেশ আপত্তি উঠেছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন এতে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ব্যাহত হবে এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা নষ্ট হবে। কিন্তু গণপরিষদ এই যুক্তি গ্রহণ করেনি। ডঃ বি সি রাউত লিখেছেন, However, the constituent Assembly out this demand and defended this provision on economic grounds' — (ডেমোক্র্যাটিক কন্‌স্টিটিউশান অফ ইণ্ডিয়া, পৃ : ১০৬)। বলা দরকার — এই ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন অন্যতম সদস্য ঠাকুরদাস ভার্গব। তিনি জানিয়েছিলেন যে, মুসলিম যুগেও ব্যাপক গো-হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া চীন, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্তান ইত্যাদি রাষ্ট্রও এই ব্যাপারে সক্রিয়তা দেখিয়েছে। তিনি আরও বলেছিলেন এই নিষেধাজ্ঞা মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত তৃতীয় অধ্যায়ে থাকলেই ভাল হোত। তবে এটাকে সমঝোতা প্রয়াস হিসেবে চতুর্থ অধ্যায়ে রাখাটাও একটা বিচক্ষণতার ব্যাপার হবে (ডঃ পঞ্চানন মিশ্র — দ্য মেকিং অফ দ্য ইণ্ডিয়ান রিপাব্‌লিক,

একটি কসাইখানা

পৃ : ১১৬)।

বলা বাহুল্য, তাঁর বক্তব্যই গণপরিষদে গৃহীত হয়েছে। আরও বড় কথা হলো — নির্দেশমূলক নীতি সংক্রান্ত অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট বিষয়গুলোর গুরুত্বও কম নয় — বলবৎযোগ্য না হলেও এই নীতিগুলোকে সব ধরনের সরকারই অনেকটা মর্যাদা দিয়েছে। আদালত রায়দানের সময় এগুলোর উল্লেখ করেছে এবং প্ল্যানিং কমিশন 'useful guidline হিসেবে গণ্য করেছে — (ডঃ সুভাষচন্দ্র কশ্যপ, আওয়ার কন্সটিটিউশান, পৃ : ১৩৪)।

সুতরাং বলা যায় গো-সংরক্ষণও আমাদের সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় জীবনের একটা অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই ব্যাপারে কোনও সরকার দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে — যেহেতু মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই গো-মাংসকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করেন, গো-ধ্বংসের

ব্যাপারটা তাঁদের ধর্মীয় অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে কিনা।

প্রথম কথা হল — গো-মাংস খাওয়া-না-খাওয়া ব্যক্তিগত ব্যাপার — সংবিধান এই বিষয়ে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। সংবিধান নিষিদ্ধ করেছে ব্যাপক গো-হত্যা বা Slaughter-কে। দ্বিতীয়ত, এক্ষেত্রে ধর্মের কথা উঠতে পারে না। ২৫ নং অনুচ্ছেদে আছে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর পছন্দ মতো ধর্ম গ্রহণ, ধর্মানুষ্ঠান পালন ও প্রচার (Profess, Practise and Propagate') করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে 'Practise' কথাটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হল, ব্যক্তি একটা ধর্মমত গ্রহণ করলে সেই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত সব অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকলাপ পালন করতে পারেন। কিন্তু কোন ক্রিয়াকলাপগুলো সেই ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ এবং কোনগুলো সেই ধরনের নয় — সেটা কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় নির্ধারিত করতে পারে না। সেই কাজটা আদালতের। একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু প্রথাও প্রচলিত থাকতে পারে — দেখতে হবে কোনগুলো সেই ধর্মের সঙ্গে অঙ্গীভূত। দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন, 'What constitutes the essential part of a religion is primarily to be ascertained with reference to the doctrines of that religion itself, which are subject to judicial scerting' — (কন্‌স্টিটিউশনাল ল' অফ্ ইন্ডিয়া, পৃ : ৮৪)। এই প্রসঙ্গে হিন্দু রিলিজিয়ান এণ্ডাউমেন্ট বনাম স্বামীয়ার মামলায় উচ্চারিত সুপ্রীম কোর্টের রায় উল্লেখ করা যায়। ব্যক্তি ধর্মাচার পালন করতেই পারেন। কিন্তু বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সেই ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ কিনা, সেই কথাটা নির্ধারণের ক্ষমতা আদালতেরই (দুর্গা কমিটি বনাম হুসেন, ১৯৬১)। এই কারণে 'সতী' বা 'দেবদাসী' প্রথাকে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত ক্রিয়া বলে গ্রহণ করা হয়নি (সইফুদ্দীন বনাম বম্বে, ১৯৬২)। ঠিক তেমনি, কুরেশী বনাম বিহারের (১৯৫৯) মামলাতে সুপ্রীম কোর্ট জানিয়েছিল যে, গো-মাংস খাওয়াটা ইসলাম ধর্মের অঙ্গীভূত কোনও আবশ্যিক ক্রিয়া নয়। সুতরাং ব্যাপক গো-হত্যা নিবারণের জন্য যদি কোনও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়, তাহলে কারোও ধর্মে আঘাত করা হয় না, ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের অভিযোগও টেকে না। ইমানুয়েল বনাম কেরালার মামলায় (১৯৮৭) সর্বোচ্চ আদালত আরও জানিয়েছিল যে, একটা প্রচলিত রীতি বা ক্রিয়াকে আন্তরিকভাবে ও জ্ঞানত ধর্মীয় ব্যাপার বলে মেনে নেওয়া হয় কিনা সেটাও দেখতে হবে (জি এস পান্ডে — কন্সটিটিউশনাল ল' অফ ইন্ডিয়া, পৃ : ১৬৭)। সুতরাং বলা যায় — ৪৮ নং অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রের ওপর একটা গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। এই দায়িত্ব কিছুতেই শাসকরা এড়িয়ে যেতে পারেন না।

ডঃ এস এন সিক্রি মন্তব্য করেছেন, গো-পালন ও সংরক্ষণ বিষয়ক ৪৮ নং অনুচ্ছেদটা এসেছে গান্ধীবাদী আদর্শ ('Gandhian principles') থেকে (ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ : ৬৩)। কিন্তু বলা দরকার — বক্তব্যটা একেবারেই ভ্রান্ত। এটার সঙ্গে আসলে জড়িত আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জীবন-চেতনা, আদর্শ ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব। একটু অতীতের অনুসন্ধান করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতা নামে, তার যুগটা খৃষ্টপূর্ব ৩২৫০-২৭৫০ অব্দ — সুতরাং এই সভ্যতা মিশর, এশিরিয়া ইত্যাদির সমকালীন বা প্রাচীনতর (ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ — প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, পৃ : ২২২)। তাতে বিভিন্ন পশু-বেষ্টিত যে ধ্যানমগ্ন দেবতার মূর্তি পাওয়া গেছে, সেটাই মনে হয় আর্যযুগের শিবের পূর্বরূপ। তাঁর বাহন ষাঁড়। তখন ষাঁড়ও ছিল পূজ্য। কুকুর, হাতী, গণ্ডার, ভেড়া, হরিণ, মোষ, হাঁস প্রভৃতির মূর্তি দেখে মনে হয় এগুলো তখনও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, কিন্তু এদের কেউ পূজা পায়নি।

পরবর্তী আর্য-যুগে কৃষি ও পশুপালন জীবিকা হিসেবে আরও প্রাধান্য পেয়েছে। অথর্ব বেদ থেকে জানা যায় যে, গবাদি পশু ছিল সেই যুগের প্রধান অস্থাবর সম্পত্তি — কিন্তু এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কৃষিই ছিল জীবিকার প্রধান উপায়

গো-রক্ষা ঃ বিশিষ্টজনের মত

''গো-জাতিকে রক্ষা করলে আমরাও সুরক্ষিত থাকবো। গ্রামের প্রতি পরিবারে এবং প্রত্যেক পাড়ায় গোশালা থাকা উচিত। এর সঙ্গে দরকার বিস্তৃত গোচারণভূমি। গোরু বিক্রয় করার জন্য কখনোই হাটে-বাজারে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। কারণ এতে কসাইদের (গো-হত্যাকারীদের) গোরু-বলদ কিনতে সুবিধা হয়।''

— পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

— (ডঃ ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় — ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। পৃ : ১৩)। মনে হয়, কৃষির ওপর নির্ভরতার ফলে ক্রমে ষাঁড় ও গরু একটা আলাদা মর্যাদা পেয়েছে। ডঃ রামশরণ শর্মা লিখেছেন — পরবর্তী কালের বৈদিক গ্রন্থে ছয়, আট, বারো — এমনকি চবিবশটা দাঁড়ে টানা-লাঙ্গলের উল্লেখ পাওয়া গেছে। এতে অতিরঞ্জন থাকতে পারে — কিন্তু এর দ্বারা গবাদি পশুর গুরুত্বটাও প্রমাণিত হয় (এন্‌সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, ভাষান্তরে 'প্রাচীন ভারত', অনু : সুমন চট্টোপাধ্যায়, পৃ : ৬৮)। কৃষিকাজও ছিল সম্মানের। সীতার পিতা রাজা জনক লাঙ্গলে হাত দিতেন, কৃষ্ণের দাদা বলরামের অন্য নাম হলধর অর্থাৎ যিনি লাঙ্গল ধরেন।

এই প্রসঙ্গে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও কালীকিঙ্কর দত্তের বিখ্যাত 'অ্যান অ্যাড্‌ভ্যান্সড্ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া'-র স্মরণ নেওয়া যাক — 'The rearing of cattle and other domestic animals was sarcely less important than agriculture cows were held in much esteem and milk formed important part of the dietary in the Vedic Household' (পৃ:-৩৪)। ডঃ নিশীথরঞ্জন রায়ও মন্তব্য করেছেন — 'Milk and milk products like ghee and curd were very popular' (এ শর্ট হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া পৃ : ২১)। সেই সময় বিভিন্ন পরিবারের যেমন চাষের জমি থাকত তেমনি সর্ব-সাধারণের গোচারণ ভূমিও নির্দিষ্ট থাকত।

সংক্ষেপে বলা চলে, সেই সামাজিক জীবন কৃষি নির্ভর হলেও তাতে পশুপালনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই দরকার ছিল গো-পালনের। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাই মন্তব্য করেছেন, "Cows and bullocks formed their chief wealth. Much attention was naturally devoted to cattle rearing, and many a singer represent the cow as the sum of all good which Indra has created for our enjoyment' (এন্‌সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, পৃ : ৫৭)।

শিবের বাহন হিসেবে ষাঁড়ের উল্লেখ আগেই করেছি। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছে গো-বালক হিসেবে, তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে গো-বেষ্টিত হিসেবে। এভাবে অর্থনৈতিক বিষয়টা ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে মিশে গেছে, গরু হয়ে উঠেছে 'গো-মাতা'। এটা আদৌ গান্ধীজীর অবদান নয় — এটা হিন্দু সমাজের প্রাচীন উত্তরাধিকার।

সুতরাং বলা যায় — গো-পুজো ও সংরক্ষণের ব্যাপারগুলো আমাদের হাজার হাজার বছরের ধর্মীয় আবেগ ও জীবনযাত্রার মধ্যেই রয়েছে। অনেকে বাড়িতে মোষ, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি পোষেন, কেউ কেউ মুরগী, হরিণ, ছাগল, শূয়োর, হাঁস ইত্যাদির পালন করেন। কিন্তু গোরুর মতো মর্যাদা কেউ পায় না। ছাগল, মোষ ইত্যাদিও দুধ দেয় — কিন্তু বৃদ্ধ ও শিশুর পানীয় হিসেবে আজ গোরুর দুধের বিকল্প নেই। গোবর দিয়ে এখনও অনেক বাড়ির উঠোন লেপে পবিত্র করা হয়। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে গোরু দান করে সম্মান জানানো হত। এখন সেটা উঠে গেছে — কিন্তু গো-ব্রাহ্মণে প্রণামের রীতিটা অনেক জায়গায় টিকে আছে। পরিবারের জন্য গোরু কেনা হলে মহিলারা এখনও সিদুঁর তার শিঙ ও ক্ষুরে ছুইয়ে প্রণাম করেন।

গো-রক্ষা ছিল রাজ্যের অন্যতম কর্তব্য। বিরাট রাজার আশ্রয়ে থাকার সময় তাঁর ষাট হাজার গোরু হরণের সময় অজ্ঞাতবাসে থাকা সত্ত্বেও তাঁর হয়ে ভীম-অর্জুন কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। সেটাও ছিল এক ধর্মযুদ্ধ।

সেই জন্য বলা যায় — সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে (৪৮ নং অনুচ্ছেদ) গো-ধবংসের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাটা আদৌ অদ্ভুত বা অন্যায় ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক দিকটা জড়িত, কারণ আজও ভারত কৃষিপ্রধান দেশ — চাষের কাজ লাঙ্গল ও বলদ দিয়েই হয়। তাছাড়া দই ও দুধ জাতীয় খাবারের জন্যও আমরা গোরুর ওপর নির্ভরশীল। তার ওপর যুগ সঞ্চি ত একটা ধর্মীয় আবেগ তো আছেই।

ডঃ বিদ্যাধর মহাজন মন্তব্য করেছেন, এই বিষয়ে কুরেশীর মামলাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া অনেক রাজ্যও এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জানিয়েছে আইনের মাধ্যমে — 'Laws have been passed in many states prohibiting the slaughter of cows and calves....'(দ্য কন্সটিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ : ১৪৮) । ইসলামে যদি গো-মাংস খাওয়াটা অবশ্য পালনীয় হতো, তাহলে এই ব্যাপারে একটা সম্প্রদায় আপত্তি জানাতে পারত। এই কারণেই এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কোনও সমালোচনা করা যায় না।

ডঃ অনুপচাঁদ কাপুর মনে করেন, এই ধরনের নির্দেশমূলক নীতির রূপায়ণের মাধ্যমে দেশটাকে 'Gandhian state'-এ রূপান্তরিত করা যাবে (দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ : ১৫৬)। কিন্তু আবার বলি এক্ষেত্রে গান্ধীজী প্রসঙ্গটা অবান্তর — বলা দরকার, এটা হল আমাদের ঐতিহ্য, ইতিহাস ও জীবনধারার অনুসারী। এর ভিতটা রচনা করেছে আমাদের অর্থনীতি, ধর্মবোধ, জীবনদর্শন ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী।

অবশ্যই এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে গন্ডগোল — এমনকী দাঙ্গাও হতে পারে। ডঃ হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন, আমাদের এগুলোর জন্য কোনও কারণের দরকার হয় না — আবেগ ও গুজবই যথেষ্ট — 'Very often there is no rhyme or reason of the riots' — (ইণ্ডিয়া ঃ ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ : ৪০১)। আর অশিক্ষিত ধর্মগুরুরা তাতে ইন্ধন দিয়ে যাবেন।

শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা মানুষকে এই ক্ষুদ্রতা নীচতার ঊর্ধে নিয়ে যেতে হবে। শাসকদের চিন্তার মূলে থাকবে ভোট প্রাপ্তি নয় — যুক্তিবাদ, সাহসিকতা ও জনকল্যাণের ব্রত। ●

গাধার জন্য গোরু বাড়ছে না

অসিতবরণ আইচ

জীবনের প্রথম রচনা লেখার বিষয় সম্ভবত সকলের ক্ষেত্রে ছিল গোরু। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ ছাড়া দুধ খুব পুষ্টিকর আর গোবরে ভালো সার হয়— এই পর্যন্ত জ্ঞানই অদ্যাবধি প্রায় সকলের ভাণ্ডারে আছে। গভীরে যাবার ইচ্ছা বা সুযোগ অধিকাংশেরই নেই। ধনার্জন ও ধনকেন্দ্রিক জ্ঞানার্জন লিপ্সা পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে। যাদের নিজেরই সামাজিক চেতনা নেই, অন্য কোনও জীব-জন্তুর সমাজে কী ভূমিকা আছে তা জানার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অথচ আমাদের পূর্বজেরা আমাদের জন্য অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার রেখে গেছেন।

দেবী লক্ষ্মী গাভীদের কাছে গিয়ে একটু আশ্রয় প্রার্থনা করলে গাভীসমাজ চঞ্চ লা বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। গাভীসমাজে সমাদর লাভ না করলে দেবসমাজে যতই সমাদৃতা হোন না কেন পরিতাপের অবধি থাকবে না — এই বলে কান্নাকাটি শুরু করায় গাভীসমাজ অনুগ্রহ করে লক্ষ্মীকে বলেছিল, তথাস্তু, আপনাকে আমাদের সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ স্থান অর্থাৎ পুরীষে ও মূত্রে অধিষ্ঠিতা করলাম। লক্ষ্মীদেবী অত্যন্ত প্রীতা হলেন।

লক্ষ্মী মানে শ্রী-রূপ-প্রাণ-সম্পদ-শক্তি-শান্তি — এসব কিছুই পাওয়া যায় গোবর ও গোমূত্রে। গোমূত্রে যা যা পাওয়া যায় অন্য কোনও বস্তুতে পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। পথ্য ও ওষুধ উভয়তঃ মানবজীবনে অত্যন্ত কল্যাণকর গোমূত্র ও গোবর রস।

গোমূত্রে জল ছাড়াও পাওয়া যায় নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফেট, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, কার্বোলিক অ্যাসিড, আয়রন, সিলিকন, ক্লোরিন, ম্যাগনেশিয়াম, স্যালিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, ট্যাট্রিক অ্যাসিড, সাক্সেনিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, লবণ, ভিটামিন-এ, বি, সি, ডি, ই, মিনারেল, ল্যাক্টোজ, এনজাইমস্, হিপ্যুরিল, অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, হরমোনস্, স্বর্ণক্ষার ইত্যাদি। পিঠে কুঁজ আছে এমন দেশী গাই গোরু বা বাছুরের সুস্থ অবস্থার গোচনা বা গোবর গ্রহণ করতে হয়। ধুতি বা শাড়ির টুকরো আট ভাঁজ করে ছাকনি বানিয়ে সরাসরি গোমূত্র ছেঁকে নিয়ে অর্ধেক পেয়ালা বড়রা গ্রহণ করতে পারি। ছোটোরা তার অর্ধেক নেবে। আর এক চিমটি টাটকা গোবর এক পেয়ালা জলে গুলে ওই আট ভাঁজ কাপড়ে ছেঁকে খেতে হয়। এই গোমূত্র ও গোবর রস সেবনের উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না। ব্যাধিতে বা নিব্যাধিতে সর্বাবস্থাতেই খাওয়া যায় তবে খালি পেটে। আজকাল গোমূত্র আরক পাওয়া যায় বোতলে করে। সেই আরক অবশ্যই জল মিশিয়ে খেতে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গুজরাটে একটি হাসপাতাল আছে যেখানে গোবর আর গোমূত্র দিয়েই চিকিৎসা হয়— অন্য কোনও ওষুধ ব্যবহার করা হয় না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত গাধাদের জন্যই ভারতবর্ষে গোবর্ধন ও গোরক্ষণ অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনে গাধা সরিয়ে গোরক্ষা করতেই হবে। গোরক্ষা মানে মানবতা রক্ষা, গোবর্দ্ধন মানে সুখ বর্দ্ধন। গো-পালন মানে — দেবীপূজন।

গাভীতো যেমন তেমন জন্তু নয়।
হিন্দুরা গাভীকে ভক্তিভরে মাতা কয়।।
গাভীর মতো তৃণভোজী অনেক আছে দুধ দেয় জানি।
সবার সেরা গাভীর দুগ্ধ চিরকালই মানি।।
অনেক গবেষণা করে মুনি-ঋষিরা কয়;
গাভীর দুধে বিদ্যা-বুদ্ধি, শুদ্ধ শক্তি হয়।
গাভী দর্শনে পুণ্য, পালনে সর্বপাপ ক্ষয়।
লক্ষ্মীদেবী থাকেন নিত্য গোবরে-গোচনে।
গোবর, গোচনা লাগে সর্বব্যাধি নিরসনে।।
ক্যান্সার বলো, এইডস্ বলো, বলো কোষ্ঠকাঠিন্য
সর্বরোগে মহৌষধ সে তো সর্বজন মান্য।।
জন্তু হয়েও মানবসেবায় গাভীর অসীম অবদান।
আহাম্মক আমরা তাদের করিনে সম্মান।।

সীমান্তে বাড়ছে জনসংখ্যা কমছে গবাদি পশু

নবকুমার ভট্টাচার্য

ভারত গরীব দেশ। মাথাপিছু আয় ৫০০ মার্কিন ডলার। বিশ্বের সবচেয়ে ধনীদেশে কিন্তু এই আয় ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। আমাদের দেশে মানুষজনের একবড় অংশের জীবন-যাপন গরীবি রেখার নিচে। কিন্তু এই দারিদ্র্য থেকে মুক্তির উপায় কী?

আমাদের দেশে দুগ্ধ উৎপাদনের শত-সহস্র শতাব্দীর প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সঙ্গে দুধ-দই-ননীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা আমরা সকলেই জানি। ভারতবাসীর আহার্যের তালিকায় চিরকাল দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পদার্থ উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রেখেছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধি উভয় নিরীখেই পশুপালনের বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে। বর্তমানে দুগ্ধ উৎপাদনের নিরীখে ভারত বিশ্বের এক নম্বর দেশ। বার্ষিক ৯ কোটি ২৪ লক্ষ মেট্রিক টন দুগ্ধ উৎপাদিত হয় এদেশে। কিন্তু বিগত চল্লিশের দশকে দুগ্ধ উৎপাদন এবং দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ দুই-ই ছিল অসংগঠিত ক্ষেত্রের হাতে। উৎপাদিত দুগ্ধের গুণগত মান বৃদ্ধির প্রতি নজর দেওয়া হোত সামান্যই। শহরগুলিতে দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র ও খাটালগুলি জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সমস্যা সৃষ্টি করত, অন্যদিকে তেমনি এর ফলে গ্রামাঞ্চলে পশুপালন ব্যবস্থাও চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ক্রেতাদের সামনে কোনও বিকল্প না থাকায় একরকম বাধ্য হয়েই এমন দুধ ও দুগ্ধজাত পদার্থ কিনতে হচ্ছিল যার গুণগত মান নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন ছিল। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন খামারিরা বা ডেয়ারির মালিকেরা। ১৯৫০ সালে আমাদের দেশে উৎপাদিত মোট দুগ্ধের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ১ কোটি ৭০ লক্ষ মেট্রিন টন। ১৯৫০ সালে প্রতিদিন মাথাপিছু দুধের বরাদ্দ ছিল মাত্র ১০২ গ্রাম, বর্তমানে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৫ গ্রাম। আজকের এই উন্নতির পেছনে গ্রামীণ সমবায়গুলির বিরাট অবদান রয়েছে। সারা ভারতে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ কৃষক পরিবার এই ডেয়ারি সমবায়গুলির সঙ্গে যুক্ত এবং দেশের প্রায় ১ লক্ষ গ্রামে ডেয়ারি সমবায় সমিতি রয়েছে। দেশে সাধারণ মানুষজনের মধ্যে অপুষ্টিজনিত সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে ডেয়ারি সমবায়গুলিকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে। আধুনিক ভারতে মহিলাদের সামনে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় সুযোগ করে দিয়েছে ডেয়ারি সমবায়গুলি। দেশে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ পরিবারের মহিলারা গরু ও মোষ পালন করেন। আমাদের জনসংখ্যার এই অবহেলিত নারীসমাজের জন্য আর কোনওভাবেই এত কার্যকর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা আছে কি? কিন্তু সম্প্রতি দেশে গবাদিপশুর সংখ্যা আশ্চর্যজনক ভাবে কমার ফলে ডেয়ারি সমবায়গুলি আবার ধ্বংসের পথে যেতে বসেছে। ন্যাশনাল কমিশন অন ক্যাটল বা এন সি সি'র এক রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে এদেশে গো-সম্পদের প্রচুর ঘাটতি হয়েছে। ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সালের মধ্যেও তার বিশেষ হেরফের ঘটেনি। রিপোর্ট অনুসারে ১৯৯২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত যেসব রাজ্যে উল্লেখযোগ্য হারে গো-সম্পদ কমে গেছে তার মধ্যে রয়েছে ওড়িশা, অসম, মণিপুর, সিকিম, মিজোরাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ এই অবস্থার অবনতি ঘটছে। দেশের জনসংখ্যা ২০০২ সালে যখন ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছিল তখন সারাদেশে গবাদি পশুর সংখ্যা কমতে কমতে নেমে এসেছিল মাত্র ২০ কোটিতে। এই অবস্থার বর্তমানেও কোনও পরিবর্তন হয়নি অথচ দেশের জনসংখ্যা আজ ১১০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এদেশে এখন গড়ে প্রতি ৫ জন মানুষের জন্য রয়েছে মাত্র একটি করে গোরু বা মোষ। অথচ ১৯৫১ সালের গণনার সময়ও দেখা গেছে সারাদেশে ৪৫ কোটি মানুষের জন্য ১৫ কোটি গবাদি পশু, যা কিনা প্রতি তিনজন মানুষের জন্য একটি। অর্থাৎ বিগত ৫৫ বছরে জনসংখ্যা বেড়ে গেছে ৬৫ কোটিরও বেশি কিন্তু গো-সম্পদ বেড়েছে মাত্র ৫ কোটি। এই বাড়তি জনসংখ্যার নিরীখে গোরু-মোষের সংখ্যা হয়েছে প্রতি ১১ জনে একটি করে। যদিও প্রতি ২ জন মানুষের জন্য গড়ে ১টি করে গোরু মোষ থাকা বাঞ্ছনীয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং গো-সম্পদ হ্রাসের আশঙ্কা করে সর্দার বাহাদুর দাতার সিং-এর নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালে সরকার একটি কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি প্রস্তাব দিয়েছিল ভারতে গো-হত্যা কোনওমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এজন্য কমিটি একটি আইন বলবৎ করারও সুপারিশ করেছিল সরকারের কাছে। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে গো-সম্পদের ওপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। যাতে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি ঘটানো যায়। ঠিক করা হয়েছিল প্রতি গ্রামে ৫০০ গোরু থাকবে এরকম তিন

গো-পাচারের চেষ্টা রুখে দিচ্ছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা।

থেকে চারটি গ্রামকে ঘিরে একটি করে কেন্দ্র গঠন করা হবে। প্রথম পরিকল্পনায় এরকম ৬০০টি 'কি ভিলেজ স্কিম' তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে তা সাফল্য লাভ করেনি। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের রেলমন্ত্রক নানাসময় ট্রেনে গো-চালান সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে গো-সম্পদকে আরও ব্যাপক হারে কসাইখানায় অথবা বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করার ফলে অবস্থা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক নানা তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে এখন এই রাজ্য দিয়েই সব চাইতে বেশি গোরু-মোষ এবং গোমাংস বিদেশে চালান হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে গোরু-মোষ চুরি এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বেসরকারি সমীক্ষা অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের ২৩৭৪ কিলোমিটার সীমানা দিয়ে মাসে ৩ লক্ষ অর্থাৎ বছরে ৩৬ লক্ষ গবাদি পশু পাচার করা হয়। বি এস এফ-এর হিসেব অনুসারে তাঁদের হাতে মাসে ৫০০ গবাদি পশু অবৈধভাবে পাচার হওয়ার সময় ধরা পড়ে। এই সমস্ত গবাদিপশুও পাচার করার জন্য হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা থেকে পশ্চিমবঙ্গে আনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে যেমন মুর্শিদাবাদ, নদীয়া বা উত্তর ২৪ পরগণার মানুষেরা আর গৃহপালিত পশু গোরু-মোষ পালন করতে সাহস পাচ্ছেন না। কারণ ওই পশুগুলি রক্ষা করাই বড় সমস্যা এখন। এই অনীহার কারণে সীমান্ত গ্রামগুলিতে গো-সম্পদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে খুব দ্রুত গতিতে। যেমন মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর থানার সীমান্তবর্তী একটি গ্রামের নাম মোহনগঞ্জ। সেখান থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত প্রায় ৪ কিলোমিটার। বাংলাদেশ সীমান্ত ও মোহনগঞ্জের মধ্যবর্তী প্রায় ৩০০০ বিঘা জায়গা অনাবাদী। কারণ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রাম কানুপুর ও খিদিরপুরের মানুষেরা ভারতের এই এলাকাটিতে চাষ-আবাদে প্রায় বাধার সৃষ্টি করে। চাষ আবাদ না হওয়ার ফলে মোহনগঞ্জ গ্রামের মানুষেরা দুধ বিক্রি পেশা হিসেবে গ্রহণ করে, কিন্তু সেখানেও সমস্যা। বাংলাদেশী ডাকাতেরা গোরু লুঠ করে নিয়ে যায় প্রায় সময়। বি এস এফ কখনও কখনও লুঠ করা গোরু ধরে ফেললেও, তারাও কিন্তু সেই সমস্ত গোরু বাজেয়াপ্ত করে নীলাম করে দেয়। মোহনগঞ্জের পাশ্ববর্তী ডিগরী, ঘোষপাড়া, রাজপুর, গোবিন্দপুর বা নদীয়ার সীমান্ত অঞ্চল করিমপুর, নাকাশীপাড়া, কৃষ্ণগঞ্জ, কালীগঞ্জ সর্বত্রই এক অবস্থা।

গত ১৯৯৯ সালে সীমান্ত অঞ্চলের একটি গ্রামে যেখানে গোরু-মোষের সংখ্যা ছিল ৮০টি, বর্তমানে তা নেমে এসেছে পাঁচ বা সাতটিতে। গো-সম্পদ এইভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে সীমান্তের গ্রামগুলিতে শিশু ও বৃদ্ধরা অপুষ্টিতে ভুগছেন। এই অবস্থা চলতে থাকলে দুধের আরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। দুধের অমিল এবং অপুষ্টির মাত্রা আরও বাড়তে বাধ্য। অন্যদের কথা বাদ দিলেও যারা কেবল নিরামিষ ভোজন করেন তাদের অবস্থা সঙ্গীন হতে বাধ্য। তাই অদূর ভবিষ্যতে দেশ যাতে একেবারে গো-সম্পদশূন্য হয়ে না পড়ে সেজন্য এখনও সময় রয়েছে। সরকারের উচিত তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়ার। গো-সম্পদ রক্ষার জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠন করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। গো-পাচার রোধ করাই হবে এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। উল্লেখ্য রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে এই ধরনের কমিশন রয়েছে। বলাই যায়, পশ্চিমবঙ্গে এরকম কমিশনের কথা ভাবা হবে না কোনওদিনও। আমাদের পাশের রাষ্ট্র নেপালে গো-সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য প্রতিবছর 'শ্রীপশুপতি গোরক্ষা জাগরণ রথযাত্রা' অনুষ্ঠিত হয়। নেপাল রাজের সরকার এই রথযাত্রার আয়োজন করে। গো-সংরক্ষণ ও সংবর্ধন এর মূল উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেআইনি গোরু পাচারের সঙ্গে চোরা-কারবারীরা ছাড়াও নানা সংস্থা ও এজেন্সিও কমবেশি যুক্ত। ভারতের গো-সম্পদ বাংলাদেশের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও লোভনীয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে ২০০৪ সালে ১৬৩৯ জন গোরু পাচারকারী ধরা পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে। ২০০৫ সালে এই সংখ্যা ১৮৩৯, ২০০৬-তে ১৯৯২ এবং ২০০৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৭৮৯ জন। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে দ্রুতগতিতে। এই স্থান দখল করছে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা। এই মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের কৌশল হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের গো-সম্পত্তি লুঠ করে তাদের অন্যস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া এবং সেই সুযোগে এলাকা দখল করা। তাই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু কমছে গবাদি পশুর সংখ্যা। ●

গো-রক্ষা ঃ বিশিষ্টজনের মত

"গোরু অর্থ, কাম, ধর্ম ও মোক্ষ প্রদানকারী, তাই একে কামধেনু বলা হয়। এর অনিষ্ট চিন্তাও পরাজয়ের কারণ হয়।"

— ঋষি শ্রীঅরবিন্দ

অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলায় গো-অর্থনীতি

অর্ণব নাগ

গো-অর্থনীতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ভাণ্ডারকে এক মলাটের মধ্যে নিয়ে আসতে গেলে তা নিঃসন্দেহে মহাভারত হয়ে যাবে। ডেয়ারী শিল্প থেকে শুরু করে আয়ুর্বেদ— সর্বত্রই গো-মাতার অবাধ বিচরণক্ষেত্র। তাই এই প্রবন্ধটিতে ডেয়ারী কিংবা আয়ুর্বেদ — এই বহুল পঠিত বিষয়গুলির আর চর্বিত চর্বন না করে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দা ও শেয়ার মার্কেট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান কীভাবে গো-অর্থনীতির মাধ্যমে হতে পারে তাই আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে মাথায় রাখা হয়েছে— মন্দার প্রকোপে অগ্নিমূল্য খাদ্যদ্রব্য, কেন্দ্র ও রাজ্যে পেশ করা বাজেটে বিদ্যুৎ ও রান্নার গ্যাস— এই দুটি প্রায় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ে সরকারি উদ্বেগের মতো বিষয়গুলিকে। সুতরাং আমাদের আলোচনা কৃষিক্ষেত্র, বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক মন্দা সংক্রান্ত বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকবে।

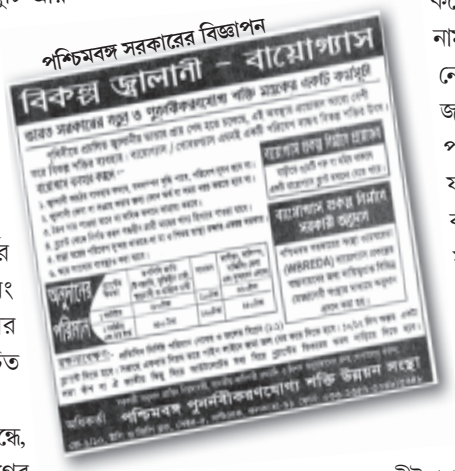

(১) কৃষিক্ষেত্র :

আধুনিক কৃষকের সর্বান্তকরণ চাহিদা উর্বর ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত জৈবসার এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন কীটনাশক। নিম্নে কৃষির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই দু'টি বিষয়ই আলোচিত হয়েছে।

সারঃ — নিম্নলিখিত তথ্যগুলি কৃষির সম্বন্ধে, বিশেষত জমিতে জৈব রাসায়নিক সারের প্রয়োগের কারণে সংঘটিত কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিকে আগে নজর দেওয়া যাক।

(ক) সারা বিশ্বের মোট কৃষিজমির প্রায় ৫২ শতাংশ কৃষি জমিই নিস্ফলা হয়ে গিয়েছে বর্তমানে। কারণ, মাত্রারিক্ত বেশি ফসলের আশায় কৃষিজমিতে ক্রমাগত কৃত্রিম জৈব-রাসায়নিক সার প্রয়োগ।

(খ) গত দশ বছরে প্রায় দেড় লক্ষ কৃষিজীবী মানুষ আত্মহত্যা করেছেন বিশ্বজুড়ে। কারণ, ফসল উৎপাদনে ভাটার টান।

(গ) ভারতে গত এক দশকে প্রায় ১৬ শতাংশ কৃষি-জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

(ঘ) দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে জীব-বৈচিত্র্য (বায়ো ডাইভার্সিটি)।

(ঙ) মাটির ভেতরের জলসীমা উদ্বেগজনকভাবে কমছে। বাড়ছে আর্সেনিকের পরিমাণ।

(চ) জমির পরিমাণ আগের তুলনায় কমেনি কিন্তু কম উৎপাদনের কারণে ভারতকে বাইরে থেকে গম আমদানি করতে হচ্ছে। *(তথ্যসূত্র ঃ পঞ্চ গব্য অ্যাণ্ড ইকনমিক হেল্‌থ অব্‌ আওয়ার কান্ট্রি বাই সুনীল মানসিংকা)*

সমস্যাগুলি মোটামুটি বোঝা গেল। কৃষিক্ষেত্রে ভারতের অবস্থাটা হচ্ছে, 'জেনেশুনে বিষ করেছি পান।' যে সমস্ত ফার্টিলাইজার বা সার জমিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে, সবগুলো না হলেও তার অধিকাংশই কিন্তু ক্ষতিকারক। এই ফার্টিলাইজারের ওপর সরকার বিপুল পরিমাণ ভর্তুকির বন্দোবস্ত করেছে। কিন্তু জমির উর্বরতা বৃদ্ধি তে গোরু থেকে প্রাপ্ত ভার্মি কম্পোস্ট্-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এর সাবেকী নাম গোবর সার। এর তো কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই-ই, উপরন্তু গোবর সার প্রয়োগ করলে জমির উর্বরতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষের সরকার বাহাদুর কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার কিনতে বহু কোটি টাকা ব্যয় করেন। ভার্মি কম্পোসট্ কাজে লাগালে সরকারের এই অপব্যয়ের পরিমাণ কমবে। এর ফলে অর্থনীতির দর্শন অনুযায়ী কোনও ধাপ্পাবাজি ছাড়াই মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তে থাকবে। জিনিসপত্রের দাম কমবে। উপরন্তু সরকারি কোষাগার ভর্তুকি গোনার হাত থেকে রেহাই পাবে।

কীটনাশক :

কৃষিক্ষেত্রের দ্বিতীয় আরেকটা বড় সমস্যা হল জমিতে রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করা। যার দরুণ উৎপাদিত ফসল বিষাক্ত হয়ে যাবার একটা নিদারুণ সম্ভাবনা থেকেই যায়। দ্বিতীয়ত, ওই কীটনাশক কোনও কারণে পার্শ্ববর্তী কোনও নদীতে গিয়ে পড়লে জলদূষণ অবধারিত। ওই বিষাক্ত জল জীবন দুর্বিসহ করে দেয় স্থানীয় গ্রামবাসীদের। এই রাসায়নিক কীটনাশক আমদানি করতে ভারত সরকারকে প্রভূত টাকা অপচয় করতে হচ্ছে, উপরন্তু ওই কীটনাশকগুলি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণ ভর্তুকিরও বন্দোবস্ত করতে হয়। গত একবছরে এই ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করায় অর্থনীতি কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার একটি তালিকা খবরের কাগজের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিম্নে দেওয়া হলো।

(ক) ভারতের চাল বিদেশে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সম্প্রতি।

(খ) ইতিমধ্যে ইরানে পাঠানো ভারতীয় গম স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। কারণ ওদেশে ভারতীয় রুটি খেয়ে অনেকের দেহেই বিষক্রিয়া

হয়েছে।

(গ) অত্যাধিক কীটনাশক প্রয়োগের কারণে ভারতের সামুদ্রিক খাদ্য চাষ-এর বিপুল ক্ষতি হয়েছে। ফ্রান্স ভারতের পাঠানো সামুদ্রিক খাদ্য— এককথায় তারা ফেলে দিয়েছে।

(ঘ) মিনারেল ওয়াটারের বোতলেও কীটনাশকের উপস্থিতি ধরা পড়েছে।

(ঙ) শাক-সব্জীর টেস্ট পাল্টে যাচ্ছে।

উপরিউক্ত সবকটা সমস্যার একটাই সমাধান হতে পারে। তা হলো গো-মূত্র। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াবিহীন অ্যান্টি বায়োটিক এবং অ্যান্টি সেপটিক এমন কীটনাশক হাতের কাছে থাকতেও আমরা বর্তমানে যে কীটনাশক ব্যবহার করছি তা শুধু কীট-কে নয়, আগামীদিনে মানব-প্রজন্মকেও ধ্বংস করে দিতে পারে।

(গ) মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি : রাসায়নিক সার জমির উর্বরতা হ্রাস করে। রাসায়নিক সারের ফলে মাটিতে যে কৃত্রিম আবরণ (ময়েশ্চার) সৃষ্টি হয় তা জমির বারোটা বাজানোর পক্ষে যথেষ্ট। ভার্মি কম্পোস্ট্ (গোবর সার) মাটির ময়েশ্চার দূর করতে সাহায্য করে। ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। আরও একটা বিষয়, গোবর জমির জলধারণ ক্ষমতাও কিন্তু বৃদ্ধি করে। সব মিলিয়ে, মৃত্তিকার উপরি উক্ত বৈশিষ্ট্যই বহু ফসলী জমির বুনিয়াদ রচনা করে দেয়।

(২) বাজেট-রূপেন সংস্থিতা :

রান্নার গ্যাস ও বিদ্যুৎ — রাতের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও এরাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁদের উদ্বেগ নিরসনে গো-অর্থনীতির কোনও বিকল্প সম্ভবত নেই।

রান্নার গ্যাস :

এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের একটি ঘোষণা গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, উল্লেখযোগ্যও বটে। তিনি তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, 'সরকার প্রতি পরিবার পিছু বছরে ৬-৮টি গ্যাস সিলিন্ডারের পেছনে ভর্তুকি দেবে। এর অতিরিক্ত গ্যাস সিলিন্ডারের জন্য সরকার কোনও ভর্তুকি বরাদ্দ করবে না।'

এই রান্নার গ্যাস অর্থাৎ লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এল পি জি) কেন্দ্রীয় সরকারকে বিদেশ থেকে আনতে হয় চড়া দামে। তারপর এই গ্যাসকে দু'ধরনের সিলিন্ডারে ভর্তি করা হয়। একটা হলো, চোদ্দ কেজি আয়তনযুক্ত লাল রঙের সিলিন্ডার, আরেকটা উনিশ কেজি আয়তনযুক্ত নীল রঙের সিলিণ্ডার। উপরিউক্ত লাল রঙের সিলিন্ডারটি গার্হস্থ্য প্রয়োজনে এবং নীল রঙের সিলিন্ডারটি বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহার করার সরকারি অনুমতি রয়েছে। উভয় সিলিন্ডারের ক্ষেত্রেই সরকার প্রভূত পরিমাণ ভর্তুকি দেয়। তবে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত সিলিন্ডারের তুলনায় গার্হস্থ্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত সিলিন্ডারে ভর্তুকির পরিমাণ প্রকৃত অর্থেই মাত্রারিক্ত। বর্তমানে গার্হস্থ্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত সিলিন্ডারের দাম প্রায় ৩৫০ টাকা এবং এই দামটা কিন্তু ভর্তুকিবিহীন অবস্থায়। এর সাথে ভর্তুকি যোগ করলে প্রকৃত দামটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবা যায়? এই ভর্তুকি দিতে দিতেই সরকারের প্রায় প্রতি বছর এক হাজার কোটি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। আর ভর্তুকিওলা ৩৫০ টাকার রান্নার গ্যাস কিনতে কিনতে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। এখন প্রশ্ন— বছরে ৬ থেকে ৮টি সিলিন্ডারে সাধারণ মানুষের কুলোবে তো? না কুলোলে বোধহয় ভর্তুকিবিহীন রান্নার গ্যাস কেনার চেয়ে লোকে না খেয়ে আত্মহত্যা করাকেই শ্রেয় বলে মনে করবেন। সবচেয়ে বড় কথা, এই যে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের কথা এলো, সরকারের একপক্ষ মনে করছে আগামীদিনে এই সিলিন্ডারের পেছন থেকে যাবতীয় ভর্তুকি তুলে নেওয়া হবে। সেরকম হলে, রেস্টুর‍্যান্টে যখন তখন ডিনার বা লাঞ্চ করা এবং রাস্তায় বেরোলেই রোল-চাউমিন খাওয়া আর সহজলভ্য হবে না।

তো এর থেকে মুক্তির উপায়? আছে একটাই রাস্তা। ফিরে যেতে হবে সেই গো-অর্থনীতির সূত্রে। অনেকে বলতেই পারেন, কাঠ-কয়লার আমলে ফেরত গেলেই তো যাবতীয় ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু কয়লা আপনি পাচ্ছেন কোথায়? সীমিত প্রাকৃতিক কয়লার

গো-রক্ষা ঃ বিশিষ্টজনের মত

"ভারতীয়দের কাছে গোরু পূজনীয়। গো-পূজনের দ্বারা পুণ্য প্রাপ্তি এবং গো-জাতির প্রতি অবহেলা মহা বিপদের কারণ হয়। গোরুর অনিষ্ট হয় এমন কাজ করা কখনও উচিত নয়।"

— শৃঙ্গেরী পীঠাধীশ্বর জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য স্বামী শ্রীভারততীর্থ মহারাজ

ভাণ্ডার তো ক্রমশ নিঃশেষের দিকে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। এখন কথা হচ্ছে— রান্নার ক্ষেত্রে বায়োগ্যাস বা গোবর গ্যাসের ভূমিকা অপরিসীম। সবচেয়ে বড় কথা এল পি জি সিলিন্ডার ফেটে গেলে যে বিপদের আশঙ্কা থাকে, গোবর গ্যাসের ক্ষেত্রে তা কিন্তু থাকে না। উপরন্তু গো-অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করলে গোবর গ্যাস উৎপাদনের কোনও সমস্যা হবে না। সম্প্রতি ভারত সরকারের নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রক এ নিয়ে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। যে সমস্ত বাড়িতে গোটা তিন-চার গোরু আছে, তারাই এই কর্মসূচীর আওতায় পড়বেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী, বাড়িতেই বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বসানো যাবে। সেই প্ল্যান্টের আয়তন অনুযায়ী অনুদান প্রদান করবে কেন্দ্রীয় সরকার। এই কর্মসূচী সাফল্যের মুখ দেখলে রান্নার গ্যাসের দামও যথেষ্ট কম হবে। এই দুর্মূল্যের বাজারে গো-অর্থনীতি আর কিছু পারুক না পারুক মানুষকে বাঁচাতে অন্তত পারবে। গোবর গ্যাসের রান্না সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও পুষ্টিকর বলেই এখন মনে করছেন বিজ্ঞানী তথা গো-গবেষকরা।

বিদ্যুৎ ঃ

কিছুদিন আগেই একপ্রস্থ দাম বেড়েছে বিদ্যুতের। দ্বিতীয়বার বিদ্যুতের দাম বাড়ার একটা সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কারণ প্রাকৃতিক কয়লার ভান্ডার প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। বিদ্যুৎ ও শিল্পের নানা কারণে চাহিদা বাড়ছে কয়লার কিন্তু যোগান অমিল। সেই কারণে দাম বাড়ছে কয়লার। গত জুলাই মাস থেকে নতুন দর হয়েছে কয়লার। পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলে বোঝা যাবে কয়লার কি বিপুল মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। জুলাই-এর আগে 'এ' গ্রেড কয়লার দাম ছিল প্রতি টনে ২৫৭৪ কোটি টাকা। জুলাই-এর পরে তা ২৩৭৬ টাকা বেড়ে কয়লার নতুন দাম হয় ৪৯৫০ টাকা। এক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি ৯২ শতাংশ। একইভাবে, 'বি' গ্রেড কয়লার আগে দাম ছিল ২৪০৫ টাকা, প্রতি টনে। বর্তমানে তা ২৩৯৫ টাকা বেড়ে ৪৮০০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। এক্ষেত্রে বৃদ্ধি ৯৯.৫ শতাংশ। আর এর ধাক্কা সামলাতে ই সি এল রাণিগঞ্জ খনির ভাল কয়লার জন্য যে দাম বাড়িয়েছে তার ফলে রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ণ নিগমের ওপর বাড়তি বোঝা চাপছে বার্ষিক ৭২৫ কোটি টাকা। এবং সি ই এস সি-র ওপরে এই বোঝার পরিমাণ ১৭০ কোটি টাকা। সব জটিল বৈদ্যুতিক হিসেব-নিকেশের পরে যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো জেলাগুলোর ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটে মাসুল বাড়বে ৪৫ পয়সা, কলকাতায় ৩০ পয়সা। **(সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা, ০২।০৮।০৯)**। ইতিপূর্বে জুন মাস নাগাদ বিদ্যুতের যে দাম বেড়েছিল তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৭০ লক্ষ গ্রাহকের জন্য ১২৫ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছিল। একে তো গোটা বিদ্যুৎ ব্যবস্থাটাই বরাবর ভর্তুকিতে চলছে। এভাবে দাম বাড়তে থাকলে দেউলিয়া সরকার আর কতদিনই বা ভর্তুকি দেবে? এনিয়ে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু একটা মোক্ষম কথা বলেছেন! যেটা আমাদের দেশের সব রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। তিনি বলেছেন, "যেভাবে জ্বালানির দাম বাড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ আর সহজলভ্য থাকবে না।" এর এক এবং একমাত্র সমাধান হলো গোবর গ্যাস। গোবর গ্যাস থেকে অনায়াসেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এই বিদ্যুৎ উৎপাদিত হওয়ার পথে কোনওরকম বায়ুদূষণ করে না। এমনিতে কয়লার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হওয়ার সময় চুল্লী থেকে যে ধোঁয়া বেরোয় তা পরিবেশকে যথেষ্টই দূষিত করে।

অর্থনৈতিক মন্দা থেকে উত্তরণ — গত বছর বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারে ধস নামার একটা বড় কারণ উপর্যুপরি আমেরিকার তিনটে ব্যাঙ্ক (লেম্যান ব্রাদার্স, ফ্যানি মে এবং ফ্রেডি ম্যাক) দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশী লগ্নিকারীরা এবং আতঙ্কগ্রস্ত এদেশীয় লগ্নিকারীরা তাঁদের সমস্ত লগ্নি অকস্মাৎ তুলে নিয়েছিলেন শেয়ার বাজার থেকে। যার দরুণ ভারতীয় শেয়ার সূচক সেনসেক্সের দ্রুত অবনমন হয়। ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতি ফের তৈরি হতেই পারে। তখন যদি উল্লিখিত বায়োগ্যাস, গোরব সার, গো-মূত্র ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি করে বেশ বড় ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা ভারত সরকারের হাতে থাকে এবং তা শেয়ার বাজারে লগ্নি করলে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি এড়ানো যেতে পারে। কারণ, শেয়ার বাজার থেকে বিদেশী লগ্নিকারীরা যতই লগ্নি তুলুন না কেন, আমাদের কাছে বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার মজুত থাকলে তা সেনসেক্সকে কোনওমতেই খাদের কিনারায় পৌঁছে দেবে না। উপরন্তু রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বাইরে থেকে আমদানী করতে যে প্রভূত পরিমাণ মাসুল গুণছে কোষাগার, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সবমিলিয়ে শক্ত বুনিয়াদের ওপর দাঁড়াবে এদেশের অর্থনীতি। আরও একটা বিষয়— মন্দায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদেশের যুব সমাজ। বর্তমানে চাকরি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে একটা হতাশাজনক নৈরাশ্য বিরাজ করছে সারা দেশজুড়ে। এই পরিস্থিতিতে গো-অর্থনীতির মুশকিল-আসান ভূমিকাটা নিম্নের বিবরণীতে স্পষ্ট। এ বিষয়ে তথ্য যুগিয়েছেন, নাগপুরের নাগ বিদর্ভ চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি, পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট শ্রী বি সি ভারতীয়া।

যে গোরু দুধ দেয় না (non-milking cow), **তার থেকে বি পি এল তালিকাভুক্ত একটা পরিবারের মাসিক কেমন রোজগার হতে পারে।**

আয় :

(ক) ভার্মি কম্পোসট (গোবর সার) থেকে রোজগার -	৪৬৬৬ টাকা
(খ) গোবর গ্যাস (বাড়িতে তৈরি) -	০০ টাকা
(গ) জৈব সার (বাড়িতে তৈরি) -	০০ টাকা
(ঘ) ঘুঁটে -	৫২৮০ টাকা
(ঙ) গো-মূত্র -	১০,০০০ টাকা
(চ) গো-দুগ্ধ -	১১৭০ টাকা
সর্বমোট -	২১,১১৬ টাকা

ব্যয় :

(ক) গোরুকে খাওয়াতে (প্রতিদিন দশ টাকা ধরলে)	- ৪৫০০ টাকা
(খ) রক্ষণাবেক্ষণ (প্রতিদিন দু'টাকা করে) -	৯০০ টাকা
(গ) পশু চিকিৎসা -	১৫০০ টাকা
(ঘ) বিবিধ খরচ -	৩১০০ টাকা
মোট -	১০,০০০ টাকা

সব মিলিয়ে একটা বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারের আয় (২১, ১১৬ - ১০,০০০) = ১১,১১৬ টাকা।

বি. দ্র. : ৪৫০টি গোরুর ক্ষেত্রে এই হিসেব কার্যকর।

এই তথ্য থেকে একটা জিনিস অন্তত পরিষ্কার, এতকাল গো-অর্থনীতিকে ছেড়ে পাশ্চাত্য অর্থনীতিকে সম্মানিত করা যেন স্বদেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর পুজো করার সামিল। ●

গো-রক্ষা,
গ্রামীণ অর্থনীতি এবং গ্রাম-স্বরাজ

সাক্ষাৎকার

কর্ণাটকের রামচন্দ্রপুরা মঠের শ্রীরাঘবেশ্বর ভারতী স্বামীজী সারা দেশে একজন সুপরিচিত সন্ত। ভারতীয় গো-বংশের ৩৩টি প্রজাতির তিনি সার্থকভাবে সংরক্ষণ করে চলেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, গোরু আমাদের জীবনকে যথার্থভাবেই সমৃদ্ধ করতে পারে। 'বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা'র তিনি অন্যতম পথনির্দেশক। গোরু ও গ্রামোন্নয়ণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কী এই সাক্ষাৎকারে তা খোলাখুলি জানিয়েছেন রাঘবেশ্বর ভারতী স্বামীজী। সাক্ষাৎকারটি এখানে পুরোপুরি প্রকাশ করা হল। — স্বঃ সঃ

❑ আপনার মাথায় বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার পরিকল্পনা কীভাবে এল?

● বুদ্ধি দিয়ে একথার উত্তর দেওয়া একটু অসুবিধাজনক। অনেক সময়ই হঠাৎ করে সুন্দর কল্পনা মনের মধ্যে উদয় হয়। এটাকে অন্তঃপ্রেরণা বলা যেতে পারে। যা মানুষের সাধারণ বোধ-বুদ্ধির উর্দ্ধে। যদি আমরা বুদ্ধি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করতে চাই, তাহলে দেখব এর অনেক কারণ আছে। কয়েক বছর আগে কর্ণাটকে এরকমই 'ভারতী গো-যাত্রা' দারুণ সাড়া ফেলেছিল। তার ফলে দেশজুড়ে এই যাত্রার পরিকল্পনা সুগম হয়। গতবছর এখানে বিশ্ব গো-সম্মেলন হয়েছিল। তখন ঠিক হয়, এই বিষয় সারা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছনো উচিত। এর মধ্যে আমি নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যাই। সেখানে আমায় সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক (নিবর্তমান) শ্রীসুদর্শনজী এবং সঙ্ঘের অন্যান্য নেতৃত্বের সঙ্গে এবিষয়ে আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়। তাঁরা সম্মত হন এবং সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তখনই আমার মনে হলো, এটা এক ঐশ্বরিক প্রেরণা। এ সময়ে ভারতের পুনর্জাগরণ প্রয়োজন। এই যাত্রা সে বিষয়ে সহায়ক হবে। এক সময় চরকাও স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে। এখন সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জনে 'গাভী' একইরকম ভূমিকা পালন করবে। চরকা নিষ্প্রাণ, 'গাভী' সচেতন-সজীব মাধ্যম।

❑ এই যাত্রার উদ্দেশ্য কি কি?

● বহুমুখী উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত, গাভী সম্বন্ধে মানুষের যে অজ্ঞতা আছে তাকে দূর করতে হবে। অজ্ঞতার কারণেই হিংসা, উৎপীড়ন করা হয় গাভীকে। মানুষ গাভীর ব্যাপক উপযোগিতা বিস্মৃত হয়েছে। মানুষকে 'সোনা দামী'-একথা বোঝাতে হয় না। কিন্তু যেহেতু তারা গোরুর উপযোগিতা জানে না, সেজন্যই গোহত্যা হয়। সবই অজ্ঞতার কারণে। আমরা যদি সম্পূর্ণভাবে তা দূর করতে পারি তাহলে গোরক্ষার জন্য বড় আন্দোলন করার প্রয়োজন হবে না। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, দেশজুড়ে যাঁরা গো-রক্ষার কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা। এক্ষেত্রে সমবেত প্রচেষ্টার অভাব দেখা যাচ্ছে। এই যাত্রার মাধ্যমে ওই সকল মানুষকে এক মঞ্চে সমবেত করা হবে। যারা এখন সক্রিয় নেই তারাও এই যাত্রার প্রেরণায় সক্রিয় হবেন। গোরক্ষা আন্দোলনে যুক্ত হবেন। গো-সম্পদ ভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নত হবে। গ্রামকে সেপথে নিয়ে যেতে হবে।

❑ গ্রামের কল্যাণে কি কাজ করা উচিৎ?

● গ্রাম ও গোরুকে পৃথক করা যায় না। এমন কোনও গ্রাম নেই যেখানে গোরু পাওয়া যাবে না। গোরু ও গ্রাম অবিচ্ছেদ্য — অভিন্ন। ভারত হল পৃথিবীর আত্মাস্বরূপ। আর ভারতের অন্তরাত্মা হল 'গ্রাম'। গ্রামের 'হৃদয়' হল 'কৃষক'। কৃষকের জিয়নকাঠি হলো গোরু। এই যে পরপর গঠিত শৃঙ্খলা — তা এখন ভেঙে গেছে। চেইন্ নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট হয়ে গেছে কৃষক এবং গোরুর মধ্যেকার আত্মিক বন্ধন। এর ফলে ভারত ও বিশ্বের মধ্যেকার সম্পর্কও বিনষ্ট হয়ে গেছে। এই সম্বন্ধ পুনরায় গড়ে তুলতে হবে। গ্রাম ও গোরুর সম্পর্ক দেহ ও আত্মার মতো। যদি আত্মা না থাকে তাহলে দেহ মৃত। তেমনই গ্রামে যদি গোরু না থাকে তাহলে সেই গ্রাম মৃতবৎ। গ্রামকে বাদ দিয়ে গোরক্ষা হয় না। সেজন্য গ্রামোন্নয়ণ ও গোরক্ষা যুগপৎ একই সঙ্গে চালাতে হবে। আমি মাঝে মাঝেই বলি — শহর

আর শহর নেই, শহর এখন জহর (বিষ)-এ পরিণত হয়েছে। সেখানে গোরুই নেই। শহরে গোশালা নেই, রয়েছে কসাইখানা। যেখানে গোরু নেই সেখানে কৃষক নেই, অরণ্য নেই, মুক্ত বিশুদ্ধ বাতাস নেই — শুধুই বিষ (জহর)। গ্রাম ও গোরুর মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ আছে। সেটাকেই সুদৃঢ় করতে হবে।

❑ স্বাধীনতার পর গোরক্ষা নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু সুফল পাওয়া যায়নি। এবারের আন্দোলনে কি কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাবে ?

● অতীতে সদর্থক ফল পাওয়া যায়নি মানে ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে না— এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয়। আমরা নিরন্তর চেষ্টা করায় বিশ্বাসী। আমরা শুদ্ধ অন্তঃকরণে সদুদ্দেশ্যে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাব। আমরা জানি নীতি নির্দ্ধারকরা চাপে না পড়লে একাজ (গো-গ্রাম রক্ষা) করবেন না। এটাই তাদের অভ্যাস। এখন আমাদের তাদের কাছে নয়, জনতা-জনার্দনের কাছে যেতে হবে। যদি জনগণ এককাট্টা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে নীতি নির্দ্ধারকদের তা অন্যথা করার সুযোগ থাকবে না। জনতা যা চাইবে তাই তাদেরকে করতে হবে। এবার গো-গ্রাম রক্ষার দাবী দু'চারজন সাধু-সন্ত নয়, সারা দেশের কাছ থেকেই আসছে।

সাধারণত, দেশে তিন গোষ্ঠীর মানুষ থাকেন। একপক্ষ গো-ভক্ত, দ্বিতীয় পক্ষ গো-রক্ষার বিরোধী এবং তৃতীয় গোষ্ঠীর লোকেরা নিরপেক্ষ। প্রথম ও দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্তরা সংখ্যায় অনেক কম। তৃতীয় পক্ষের লোকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। যতক্ষণ পর্যন্ত এই তৃতীয় শ্রেণীকে সক্রিয় করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হতাশার পরিবেশ বজায় থাকবে। সেজন্য আমাদের এই তৃতীয় গোষ্ঠীকে সক্রিয় এবং উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সংসদের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে কিছু হবে না। সমাজের সব ক্ষেত্র থেকেই গোরক্ষা ও গ্রামরক্ষার দাবী আসা দরকার।

❑ দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্যি হল কৃষকরাই কসাইকে গরু বেচে দেন। কোনও মন্তব্য ....

● এটাই সমস্যার মূল। এটা ঠিক যে, কসাইখানায় গোরুকে জবাই করা হয়। কিন্তু গোহত্যার শুরুটা হয় কৃষকের কাছ থেকেই। কৃষক, গো-পালক, গরুকে বিক্রি না করলে সমস্যা হয় না। দু'ভাবে কৃষকদের উৎসাহিত করে গোরক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। প্রথমত, কৃষকদের গোরক্ষার প্রতি আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা নির্মাণ করা। দ্বিতীয়ত, গো-রক্ষার ফলে আর্থিক লাভের বিষয়ে কৃষকদের দৃঢ় প্রত্যয়ী করে তুলতে হবে। মানুষ টাকার হিসাবটা বোঝে। তারা হিসেব করে গোরু রাখাতে লাভ না বিক্রিতে লাভ ? কৃষকদের এ বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। গোরু বিক্রি করলে কয়েক'শ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু গোরুকে রক্ষা করে পালন করলে লক্ষ টাকা রোজগার হবে। এর যৌক্তিকতা কৃষকদের সামনে তুলে না ধরলে এই সমস্যা থেকেই যাবে। এমনকী আইন প্রণয়ন করলেও গোরক্ষা হবে না। সব থেকে উপযোগী হল কসাইকে গো-বিক্রি আইন করে সম্পূর্ণ বন্ধ করা। দেশজুড়ে গোমূত্র এবং গোবর ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন। এবং এই শিল্পকে লাভজনক করে গড়ে তুলতে হবে। গো-ভক্ত শিল্পপতিদের এগিয়ে আসতে হবে। কাজ শুরু করতে হবে।

❑ এই আর্থিক পদ্ধতি জোরদার করতে কি করা দরকার ?

● অনেক দিক থেকে বহুমুখী প্রয়াস চলছে। পঞ্চ গব্য ঔষধি তৈরির কাজ চলছে। অনেক কৃষকরা গো-ভিত্তিক কৃষিকাজ করে ভালো অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আমি স্বীকার করছি — এখানে এখনও যৌথ প্রয়াসের অনেকটা অভাব রয়েছে।

গো-রক্ষা ঃ বিশিষ্টজনের মত

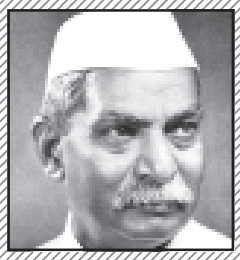

"আমি মনে করি ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে যন্ত্রের দ্বারা (ট্রাক্টর ইত্যাদি) আমরা কৃষিতে কিছুটা অগ্রসর হতে পারি, কিন্তু কৃষিতে ষাঁড় / বলদের প্রয়োজন চিরদিন থাকবে। গাই-বলদের সাহায্য ছাড়া আমাদের চলবে না।"

— ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ,
ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি

❑ **গ্রাম থেকে শহরে মানুষ চলে আসছে, তাহলে গো-গ্রাম রক্ষা কে করবে?**

● গোরুই এই গ্রাম থেকে শহরে পলায়ন রুখতে পারে। যেদিনই গ্রামবাসী বুঝবে গো-পালন করলে সমৃদ্ধি আসবে সেদিন থেকে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এছাড়া শিল্প কারখানা স্থাপনের বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া উচিৎ। একটা ছোটখাটো কারখানা গড়তে যদি ৯০ কোটি টাকা খরচ হয়ে থাকে তবে সেই টাকায় গ্রামে ৯০টি কুটীর শিল্প হতে পারে। এটা সম্ভব।

❑ **আপনি গো-রক্ষার বিবিধ কাজে যুক্ত আছেন। সে বিষয়ে যদি বলেন। কি কি কাজ করছেন?**

● কি হচ্ছে না? অনেক মানুষ এব্যাপারে অকল্পনীয় কাজ করে চলেছেন। আমাদের আশ্রমে দেশের মধ্যে একমাত্র গোশালা যেখানে ৩৩টি প্রজাতির ভারতীয় গোরু সযত্নে সংরক্ষিত এবং তাদের লালন-পালন করা হচ্ছে। এমন কয়েকটি প্রজাতির গোরু আছে যার সংখ্যা সর্বমোট দশ থেকে কুড়িটি মাত্র। এখানেই ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ বর্তমান। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী যে কয়টি প্রজাতি পাওয়া যায় তার সবকটিই এখানে আছে।

❑ **গ্রামোন্নয়ণ সম্পর্কে আপনার চিন্তা-ভাবনা কি?**

● আমি স্বপ্ন দেখি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এক গ্রামের। সেখানে কোনও কৃত্রিমতা থাকবে না। সরল জীবনযাত্রা।

❑ **সরকারিভাবেও গ্রামোন্নয়ণের কাজ চলছে। আপনি সেটা কীভাবে দেখেন?**

● ওটা কোনও গ্রামোন্নয়ণ নয়। তারা কার্যত গ্রাম-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে গ্রামকে শহরে পরিবর্তিত করছে।

❑ **রাসায়নিক সার জমিকে অনুর্বর করে দিয়েছে। উর্বরতা কীভাবে ফিরিয়ে আনা যাবে?**

● একমাত্র গোরুই একাজ করতে পারে। এখন তো রাসায়নিক সারই বেশি করে প্রয়োগ করা হচ্ছে। যখন উল্টো অর্থাৎ গোবর বেশি প্রয়োগ করা হবে তখনই ওই শুদ্ধিকরণ সম্ভব। এর আগে কৃষকদের মধ্যে গোরুর সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। এই 'বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার' এটা এক প্রমুখ উদ্দেশ্য।

❑ **এই যাত্রার বিষয়ে আপনি অন্যান্য সাধু-সন্তের সমর্থন পেয়েছেন?**

● হ্যাঁ। অনেক জৈন, বৌদ্ধ এবং শিখ সন্তরা এব্যাপারে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সমাজের সকল মত, পথ, সম্প্রদায়ের। এমনকী কিছু মুসলিম, খৃস্টান এবং পারসী নেতারা যাত্রা সমিতিতে আছেন। অনেক বরেণ্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় সন্ত এবং তাঁদের সংগঠনও রয়েছেন। যেমন, রামদেব বাবা, শ্রীশ্রী রবিশংকর, মাতা অমৃতানন্দময়ী, গায়ত্রী পরিবারের সদস্যরা, প্রণব পাণ্ড্যা প্রমুখ একাজে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছেন। দেশের বাইরেরও কতিপয় বিজ্ঞানী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিদেশের বিজ্ঞানীরা গো-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমাদের থেকে বেশি করে

অনুভব করেন। তাঁরা গো-মূত্র, গো-দুগ্ধ এবং পঞ্চ গব্য নিয়ে দারুণ সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

❑ সব মিলিয়ে দেশে গোরক্ষার বিষয়টা খুবই নিরাশাজনক। এর বদল কীভাবে হবে?

● মানুষ নিরাশায় ভুগছে কারণ তারা নিষ্ক্রিয়। যেদিনই সবাই সক্রিয় হবে সেদিনই ছবিটা পালটে যাবে। তারা ভাবছে কিছু না করেই সব বদলে যাবে। তাদেরকে ঘর থেকে বের হয়ে দুষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ১১০ কোটি মানুষের মধ্য থেকে ৫০ কোটিও যদি বেরিয়ে পড়েন তাহলে কোন্ সরকার তাদের উপেক্ষা করবে?

❑ আপনি কি রাজনৈতিক দলের কাছে কোনওরকম সমর্থন চেয়ে যোগাযোগ করেছেন?

● রাজনীতি কোনও উপকারে আসে না। এখন সময় এসেছে, রাজনীতিকে বাদ দিয়েই আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। মানুষকে রাজনৈতিক বাধ্যবাধ্যকতার উর্দ্ধে উঠে একত্রিত হতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যদি গোরক্ষা হয় তাহলে অপমৃত্যু হবে না। আর যদি গোহত্যা চলতে থাকে তাহলে কেউই নিরাপদে থাকবে না। এই আন্দোলন শুধুমাত্র গোরক্ষা-আন্দোলন নয়। এই সংগ্রাম হলো আত্মরক্ষার সংগ্রাম। যদি ভাবী প্রজন্মকে নিরাপত্তা দিতে হয় তাহলে এ আন্দোলনকে সমর্থন করতেই হবে। এ হল আত্মরক্ষা, রাষ্ট্ররক্ষা এবং সংস্কৃতি রক্ষার্থে আন্দোলন। আসুন সবাই মিলে এই ঐতিহাসিক যাত্রার শরিক হয়ে সুখ ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলি। সারা বিশ্ব এক গো-কেন্দ্রিক গ্রামে পরিণত হোক।

❑ যাত্রা সমাপ্তির পরেও কি আপনার কোনও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে?

● হ্যাঁ। অবশ্যই। এতো সবে শুরু। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অনেক গঠনমূলক কাজ করতে হবে। যদিও গোরু নিঃসন্দেহে এক ঐশ্বরিক প্রাণী তবুও এযুগে আর্থিক লাভালাভের গুরুত্ব বৈষয়িক পৃথিবীতে অস্বীকার করা যায় না। এই বাস্তবতাকে মাথায় রেখে আমাদের গো-ভিত্তিক শিল্প-পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। প্রমাণ করতে হবে গো-পালন অর্থকরী। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। সামাজিক ন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে হবে। যে ৩৩ রকমের ভারতীয় প্রজাতির গোরু এখনও অবশিষ্ট আছে তা সুরক্ষিত ও সংবর্দ্ধিত করতে হবে। ১৯৪৭ সালেও দেশে ৬০টি প্রজাতির ভারতীয় গোরু বিদ্যমান ছিল। এই আন্দোলনের বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই দৃষ্টিতে সরকারকেও বুঝিয়ে জাতীয় কল্যাণের গুরুত্ব অর্জন বিষয়ে সম্মত করতে হবে। গোরুর প্রতিপালন প্রাথমিকভাবে কৃষকের ঘর থেকে শুরু হবে। সেজন্য তাদেরকে গো-কেন্দ্রিক জীবনযাত্রা এবং কৃষি বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে। তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হল — গো-পালনকে লাভজনক প্রতিপন্ন করা। সেজন্যই গো-কেন্দ্রিক শিল্পকে গুরুত্ব দিতে হবে। গোরুকে ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে গো-কেন্দ্রিক উৎপাদনের বিভিন্ন নতুন দিক বের করে আনতে হবে। জেলায়, জেলায়, গ্রামে, গ্রামে। মোটের উপর গোরুর স্বচ্ছন্দ্যে নিরাপদ বিচরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

(সৌজন্যে ঃ অর্গানাইজার)

গো-রক্ষা ঃ বিশিষ্টজনের মত

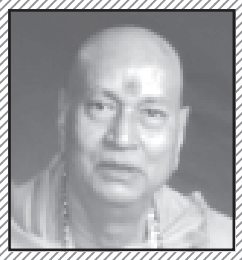

"গো-মাতাহীন ভারত বিশ্বের কাছে অভিশাপ স্বরূপ। গো-সেবা ভগবৎ সেবা, সমাজসেবা এবং" রাষ্ট্র সেবাও বটে। গো-বংশ রক্ষার জন্য সকলকে যথাসাধ্য সচেষ্ট হতে হবে।"

— পূজ্য স্বামী সত্যমিত্রানন্দ গিরি
সংস্থাপক ভারতমাতা মন্দির, হরিদ্বার।

পশ্চিমবঙ্গের গো-শালা

সতীনাথ রায়

কয়েকদিন আগে একটি বাংলা দৈনিকের শিরোনাম ছিল এরাজ্যে বাঁদরও সুরক্ষিত নয়। গত ৮ আগস্ট খোদ আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে চুরি হয়ে যায় মার্মোসেট বাঁদর । যদিও পরে তা উদ্ধার হয়। আশ্চর্যের হল, চিড়িয়াখানা থেকে বাঁদর চুরি গেলেও, রাজ্য প্রশাসনের কোনও হুঁশ থাকে না। মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গে পশু-প্রাণীর নিরাপত্তার পাশাপাশি দেখভালের বিষয়ে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি বরাবরই নেতিবাচক — উদাসীন। গোরুও ব্যতিক্রম নয় এক্ষেত্রে। উল্টে একটু ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, অন্যান্য রাজ্য যেখানেগোরুর মতো প্রাণী সম্পদকে আর্থিক বিকাশে কাজে লাগাচ্ছে, সেখানে বাংলায় গোরুকে বেশি উপেক্ষা করা হয়। দীর্ঘ ৩৩ বছরের বাম জমানায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কাজটা দূরবীণ দিয়ে দেখলেও নজরে আসে না। এমন কোনও প্রকল্প বা পরিকল্পনা প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর নেয়নি, যা গোরুর স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। অথচ পশ্চিমবঙ্গ কৃষি প্রধান রাজ্যগুলির অন্যতম। সরকারি বেসরকারি অনুগ্রহে যে কয়েকটি গোশালা চালু রয়েছে, সেগুলির দিকে মুখ ফিরে তাকানোরও অবকাশ পায় না রাজ্য সরকার। অথচ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গবাদি পশু চিকিৎসায় উন্নতি হচ্ছে বলে দাবী করা হয়। কিন্তু তাও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। বেশিরভাগ সরকারি পশু চিকিৎসালয় জেলা কেন্দ্রিক। ফলে প্রত্যন্ত গ্রামে চিকিৎসার নাম গন্ধও নেই। এবার আসা যাক গো-শালার সাতকাহন বিষয়ে।

গোশালার সাতকাহন

এদেশে প্রতিটি হিন্দুরই গভীর বিশ্বাস গোরুর দেহে তেত্রিশ কোটি দেবতার বসবাস— এই বিশ্বাসে আজও গোরুর গায়ে পা-ঠেকলে প্রণাম করা হয়। গোশালাকে সে হিসাবে তেত্রিশ কোটি দেবতার মন্দির বলা হয়। গ্রাম-বাংলায় 'গোয়াল' শব্দটি কম-বেশি সকলেরই পরিচিত। গোয়ালকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করা হয়। 'গোয়াল' ও 'গোশালা' শব্দ দুটি আভিধানিকভাবে এক হলেও, গোশালার পরিব্যাপ্তি একটু বেশিই। গোয়ালে সাধারণত যে সংখ্যক গোরু থাকে, তার মালিক সাধারণত কোনও ব্যক্তি বিশেষই। গোশালায় সেই অর্থে গরুর সংখ্যা অনেক। এদেশে গোশালার শ্রীবৃদ্ধি তে পয়লা নম্বরে চিত্রকূট।

গোশালা

গোশালার মুখ্য কার্য পদ্ধতির মূল অঙ্গই হল গো-পালন। গোরুর রক্ষণা-বেক্ষণের পাশাপাশি আর্থিক বিকাশের কথা মাথায় রেখেই গড়ে তোলা হয় গোশালা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে গোশালা পদ্ধতির প্রচলন আদিকাল থেকে। রামায়ণ-মহাভারত উল্টালে দেখা যাবে, আমাদের দেশে আদিকাল থেকে গোশালা পদ্ধতি চালু ছিল। আদিকালে এমন কোনও আশ্রম ছিল না, যেখানে গোরুর রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য গোশালা ছিল না। আশ্রমের সংস্কৃতিরও মুখ্য কথা ছিল গোশালা। ঋষিদের পাশাপাশি রাজা মহারাজারাও গো-পালনের স্বার্থে গোশালা রাখতেন নিজের রাজ্যে। রাজা জনক থেকে ধ্রুপদ পর্যন্ত এই পরম্পরা দেখা গেছে। নিজের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ রাজা জনক এক সহস্র গাভী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে দান করেন। ঋষি ওই গাভী তাঁর গোশালাতেই স্থান দিয়েছিলেন। ধেনু অর্থাৎ গোধন যে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল দুই ঋষির অর্থাৎ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রর লড়াই তার প্রমাণ। একথা এখন তাবড় তাবড় অর্থনীতিবিদ্‌ও মানেন যে, ভারতীয় অর্থনীতির প্রাথমিক মেরুদন্ডই হল গোরু। গোরুকে আর্থিক বিকাশের কাজে লাগিয়ে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, গুজরাট, উত্তরাখন্ড প্রভৃতি রাজ্য আর্থিক উন্নতি করেছে। উত্তরাখন্ডের পাহাড়ের গরুকে কেন্দ্র করে

গো-রক্ষা ঃ বিশিষ্টজনের মত

"সকল পন্থ উপপন্থের সমন্বয়ের আধার স্বরূপ, অতি-পূজ্য, পবিত্র, পবিত্রতা নির্মাণকারী, জীবনদাত্রী গো-মাতা এবং গো-জাতি শ্রদ্ধার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত এবং সদা রক্ষণীয়া।"

— পরম পূজনীয় শ্রীগুরুজী

গড়ে উঠেছে ল্যাক্টো ইন্ড্রাস্ট্রী। শুধুমাত্র গোরুর দুধ থেকে ঘি, মাখনই নয়, গোরুর মল-মূত্র থেকে ভেষজ ওষুধও তৈরি হচ্ছে। বাবা রামদেবের পতঞ্জলি যোগপীঠ, আসারাম বাপুর আশ্রম থেকে প্রতিদিনই কোনও না কোনও ওষুধ তৈরি হচ্ছে। আজকের শিক্ষিত সমাজে সেসব যথেষ্ট প্রাধান্যও পাচ্ছে। অথচ আমাদের দেশে বন সৃজন, বন উৎসবের মতো রীতি চালু থাকলেও, গোরুর সংরক্ষণের ওপর কোনও প্রকল্প বা কর্মসূচী কিন্তু হাতে নেওয়া হয় না। ফলে দিনকে দিন কমে যাচ্ছে গোশালা। উঠেও যাচ্ছে অনেক। সামাজিক কী আর্থিক কোনও দিকের কথা ভেবেও কিন্তু গোশালা শ্রীবৃদ্ধির বিষয়ে কোনও সচেতনতা গড়ে তোলা হয় না। এই চিত্র ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলায় আরও প্রকট।

কেমন হয় গোশালা

বিজ্ঞান ভিত্তিক গোশালার মূল মাপকাঠি হচ্ছে উপযুক্ত আলো-বাতাস খেলার মতো জায়গা। যেখানে গোরুর জীবন-যাপনে প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃত্রিম বাধা না হয়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার হাত থেকে বাঁচার জন্য আচ্ছাদন রাখা হয়। প্রতিটি গোরুর খাদ্য-খাবারের জন্য আলাদা-আলাদা পাত্র। নিয়মিত খাবার দেওয়ার পাশাপাশি সেসব পাত্র পরিস্কারও করা হয়। গোরুর মল-মূত্র যাতে ঠিক মতো নিষ্কাশিত হয়, তারও সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখা হয়। গোশালার সংগৃহীত গোবর আর্থিক বিকাশের এক অন্যতম মাধ্যম। কি খায় গোরু? গোরুর খাদ্য-খাবারের তালিকা দীর্ঘ না হলেও, বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দিলে গোরুর স্বাস্থ্যের পক্ষে তা মঙ্গলদায়ক। দিনে তিনবার খাবার দিতে হয়। খাবারের তালিকার প্রথম ভাগে রয়েছে খড়। এছাড়া মগ চুনি - ৩০ শতাংশ, খইল ১০ শতাংশ, ভূষি ৫৫ শতাংশ ।

সমস্যা

এবার আসা যাক, গোশালার ক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের হলেও সত্য, এরাজ্যের বেশিরভাগ গোশালাতেই আদর্শ গোশালা পরিকাঠামোর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। গোশালার জন্য প্রয়োজনীয় জমিরও অভাব থাকে। রাজ্যে গোশালার ক্ষেত্রে জমির সমস্যা বড় সমস্যা। কলকাতা পিঁজারাপোল সোসাইটির মতে, গোশালার ক্ষেত্রে জমির সমস্যা বরাবরের। গোশালার অতিরিক্ত জমির ওপর সমাজবিরোধীদের নজর থাকে। শাসকগোষ্ঠীর মদতে অনেক সময় দখলও নেয় তারা। এমন অভিজ্ঞতা অনেক গোশালার ক্ষেত্রে দেখা গেছে। এর ওপর থাকে গোশালায় নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন না মেটানোর বিভিন্ন সমস্যা। টাকার অভাবে গোশালায় কাজ করতে চান না অনেকে। এই ধরনের সমস্যা শুধুমাত্র স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত গোশালাগুলিরই নয়, সরকারি গোশালাগুলির পরিস্থিতি আরও খারাপ । গোরুর রক্ষণা-বেক্ষণ থেকে সংখ্যাবৃদ্ধি সবদিকেই রয়েছে বিস্তর ফাঁকফোঁকর। এমন অভিযোগও শোনা যায়, কখনও গোরু চোরা পথে বিক্রিও হয়ে যায়। এর ওপর গোরুর অসুখ-বিসুখ করলে আর তো কথাই নেই। অসুখ সারানোর জন্য কেউই দরদী হয়ে ওঠে না। বাঁকুড়ার সরকারি গোশালায় গিয়ে এমন চিত্রই দেখা গেল। উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরে রায়গঞ্জে যে সরকারি গোশালা চালু আছে— একমাস আগে গরুর যে সংখ্যা থাকে, দু'মাস পরে গেলে দেখা যায় সেই সংখ্যা থাকে না। অথচ কর্তৃপক্ষ এই সব উড়ো খবর বলে ধামাচাপা দেয়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ গোশালা কর্তৃপক্ষই নাকি যুক্ত চোরাপথে চোরাকাজে। মুর্শিদাবাদ, বীরভুম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হুগলীর মতো জেলাগুলিতে সরকারি কোনও গোশালাই নেই। যে ক'টি জেলায় রয়েছে, সেই গোশালাগুলিও এক প্রকার ভগবান ভরসায় চলার মতো অবস্থা। এই মুহূর্তে বাঁকুড়া, হাওড়া, নদীয়া, উত্তর দিনাজপুর জেলায় চালু রয়েছে সরকারি গোশালা।

আর্থিক বিকাশ

গোশালার পুরোটাই কাজে লাগানো যেতে পারে আর্থিক বিকাশে। কলকাতা পিঁজারাপোল সোসাইটি, শ্রী দার্জিলিং সোসাইটি, লাভ এন কেয়ার ফর অ্যানিমেলস্, বিবেকানন্দ আদর্শ সেবাশ্রম দ্বারা পরিচালিত গোশালাগুলি আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। গোশালা থেকে উপার্জিত অর্থই গোশালার পরিকাঠামো উন্নয়ণ, বৃদ্ধি ও বিকাশের

ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়। সোদপুরে পিঁজারাপোল সোসাইটির পরিচালিত গোশালাতে রয়েছে গোবর গ্যাস, শাক-সব্জীর উৎপাদনের ব্যবস্থা। গোশালার গোরুর দুধ থেকে শুধু ঘি বা মাখনই একমাত্র অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির রাস্তা নয়, গোরুর মল মূত্রও এক্ষেত্রে বিশেষ কাজে আসে। এরাজ্যে গোশালার চিত্র সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

আশির দশকের শেষের দিকে একবার জাপান সফরে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, আমাদের দেশের ৭০ শতাংশ গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থা গোরুরগাড়ি কেন্দ্রিক। ভারতবর্ষে কৃষক যেমন সত্য, গোরুও এদেশের সংস্কৃতিক পরম্পরার এক অঙ্গ। অথচ জনসচেতনতার অভাব, সরকারি উদাসীনতা ও দুষ্কৃতীদের হাত ধরে পাচার হয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির মূল কান্ডারী। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ভারতের বুক থেকে প্রতিদিনি হারিয়ে যাচ্ছে ১ লক্ষ ১০ হাজার গোরু। প্রতিদিন বাংলাদেশে পাচার হয় ১০ লক্ষ গোরু। দৈনিক এক লক্ষ গোরু হত্যা করা হয়। আজকের এই দুরবস্থা থেকে দেশকে বাঁচানোর রাস্তা একটাই— গোশালা। গোশালা সামাজিক একাত্মতার পাশাপাশি আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিরও কিন্তু বড় ভিত্তি। একথা বড় বড় পন্ডিতও স্বীকার করেন।

পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা গোশালা পরিচালিত সংস্থা

শ্রী লক্ষণগড় পিঁজারাপোল সোসাইটি — চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা
কলকাতা পিঁজারাপোল সোসাইটি — কাঁচরাপাড়া, নদীয়া
কলকাতা পিঁজারাপোল সোসাইটি — সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগণা
কলকাতা পিঁজারাপোল সোসাইটি — লিলুয়া, হাওড়া
কলকাতা পিঁজারাপোল সোসাইটি — রানীগঞ্জ, বর্ধমান
ফতেপুর (রাজস্থান) পিঁজারাপোল সোসাইটি — বড়তলা স্ট্রীট, কলকাতা
শ্রী দার্জিলিং গোশালা — শিলিগুড়ি, দার্জিলিং
কলকাতা এস পি সি এ — বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা
দ্য অল লাভারস অফ অ্যানিমেল সোসাইটি — চৌরঙ্গী ম্যানশন, কলকাতা
শ্রী বৈকুণ্ঠ পিঁজারাপোল গোশালা— জলপাইগুড়ি
কমপ্যাসিয়োন্ট ক্রাসডারস্ ট্রাস্ট — ওলাইচন্ডী রোড, কলকাতা
পশু পাখি সুরক্ষা সঙ্ঘ — সেক্সপিয়ার সরণী, কলকাতা
অ্যানিমেল অ্যান্ড বার্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি — শিবপুর, হাওড়া
বরানগর সোসাল সার্ভিস — মহারাজা নন্দ কৃষ্ণ রোড, বরানগর
নর্থ ইস্টার্ন সোসাইটি ফর প্রিজারভেশন অফ নেচার— শিলিগুড়ি
হাওড়া অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি— মহারাজ ঠাকুর রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা
লাভ এন কেয়ার ফর অ্যানিমেলস্— ডাঃ এন জি সাহা রোড, কলকাতা
দার্জিলিং গুড উইল সেলটার ফর অ্যানিমেলস্ — কালিম্পং, দার্জিলিং
কাউন্সিল ফর রুরাল ওয়েলফেয়ার — মেদিনীপুর
পিপুল ফর অ্যানিমেলস — উড স্ট্রীট, কলকাতা
বর্ধমান ডিসট্রিক্ট এস পি সি এ — স্টেশনরোড, বর্ধমান
বর্ধমান সোসাইটি ফর অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার — বর্ধমান
শ্রী ভিক্ষা ট্রামানি দেবী— মারোদীয়া চন্দ্র স্ট্রীস্ট, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং
পি এফ এ হুগলী — হুগলী
পি এফ এ শান্তিনিকেতন — মহেরালী রোড, কলকাতা
উলুবেড়িয়া এস পি সি এ — উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া
বিবেকানন্দ আদর্শ সেবাশ্রম — পশ্চিম মেদিনীপুর
আশুরালী বিবেকানন্দ স্মৃতি সঙ্ঘ — সাধুরহাট, কলকাতা
অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অফ ভেটেরিনারিয়ার্স — নফর চন্দ্র দাস রোড, কলকাতা
ফ্রেন্ডস অফ কলকাতা জু — স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা
সর্বোদয় কেন্দ্র — মেদিনীপুর
গ্রামীণ প্রাণী কল্যাণ সমিতি — ঝালদা, পশ্চিম মেদিনীপুর
কাঁথি মহাকুমা তাপসিলি উন্নয়ণ মেহেলা স্মৃতি — রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর
পুগমার্কস সোসাইটি ফর কনসারভেশন অফ নেচার‍্যাল হেরিটেজ — শান্তিনিকেতন, বীরভূম
পিপুল ফর অ্যানিমেলস্ — আলিপুর, জলপাইগুড়ি।

Swastika
Dipavali Sankhya
19 October - 2009
Rs. 6.00 • RNI No. 5257/57
Postal Regd. No. SSRM/Kol.RMS/W.B./RNP-048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L. No. MM&P.O. - SSRM-Kol.RMS/RNP-048/LPWP-021/2007-09

An Appeal

Help us to help the victims of Natural Calamity

My dear brethren,

Karnataka is reeling under an unprecedented floods caused by heavy rains. This century's most severe rain has wreaked havoc in the 18 districts of the State and has jeopardized the life of the people.

• 168 people have lost their lives in the torrential rains • About 1.8 crore people have been worst hit • About 2 lakh cattle have been washed away • 2 lakh houses have collapsed • Standing crops in 25 lakh hectares of land have been fully destroyed

The rain has damaged property worth about Rs.20,000 crore.

The State has been worst affected by this calamity. It is a challenging task to alleviate the pain and suffering of the people and rebuild their life afresh, especially in the northern parts of the State. The State Government has undertaken various measures to tackle the situation on war footing.

• It has set up 1,200 rehabilitation centres. • 3.55 lakh rain / flood-affected people have been provided food and temporary shelters. • 12 helicopters have been pressed into relief works. • 20 lakh food packets have been distributed.

Added to this, there are other immediate tasks before us like reconstruction of roads, supply of drinking water, restoration of houses and power supply, providing health care and containing the spread of epidemic diseases in the affected areas.

This massive challenge ought to be dealt with collective efforts. The Government of Karnataka solicits all help from like-minded people and organisations. In this direction, **I have already undertaken a 'Paadayatra' to different parts of Bangalore City along with my cabinet colleagues,** seeking financial help from the citizens of Bangalore.

I earnestly appeal every individual, voluntary organisation, corporate body, philanthropist to donate liberally for the noble cause of wiping the tears of the flood victims.

Donors are requested to draw cheque or Bank Draft in favour of **"Calamity Relief Fund of Karnataka - Account No. 8235-00-111-0-02.** Cheques and DDs will also be received at Bangalore-One Centres. They may also hand over the cheques at the office of Deputy Commissioner in the districts. Donors should kindly mention their name, address and phone numbers overleaf the Cheque or DD. For more details they may also **Contact Phone : 080 - 2235 3141.**

Please, come forward with the helping hand to soothe the feelings of our aggrieved brothers and sisters and bring back lasting smiles on their faces.

B. S. Yeddyurappa
Chief Minister

karnataka information